স্বামী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বামী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

ফোন :—৩৪-১৭৪৪ গ্রাম :—Publicasun, Cal.

এক টাকা চার আনা

সপ্তবিংশ মুদ্রণ
ফাল্গুন—১৩৬০
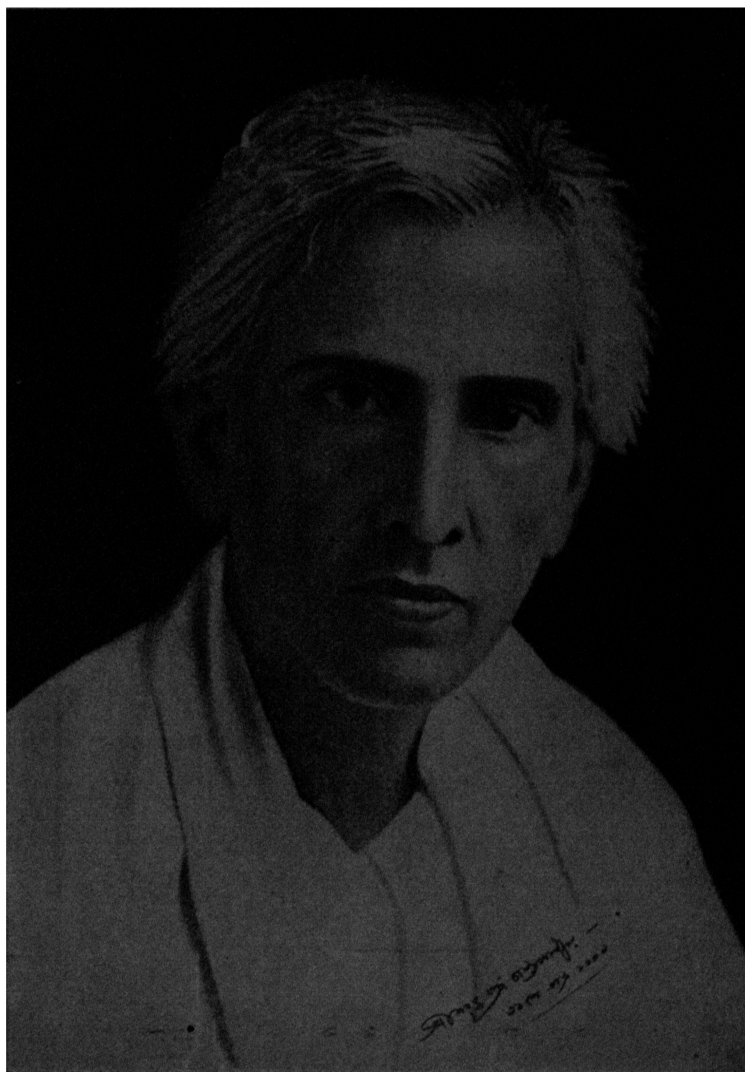
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বামী

. সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাকে এক বছরের বেশি ত তিনি চোখে দেখে যেতে পাননি, তবে এমন ক'রে আমার ভিতরে বাহিরে মিলিয়ে নাম রেখে গিয়েছিলেন কি ক'রে? বীজ-মন্ত্রের মত এই একটি কথায় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা ব্যক্ত ক'রে গেছেন।

রূপ? তা আছে মানি; কিন্তু না গো না, এ আমার দেমাক্ নয়, দেমাক্ নয়। বুক চিরে দেখান যায় না, নইলে এই মুহূর্ত্তেই দেখিয়ে দিতুম, রূপ নিয়ে গৌরব কর্‌বার আমার আর বাকি কিছু নেই, একেবারে—কিছু নেই! আঠারো, উনিশ? হ্যাঁ, তাই বটে। বয়স আমার উনিশই। বাইরের দেহটা আমার তার বেশি প্রাচীন হতে পায়নি। কিন্তু এই বুকের ভিতরটায়? এখানে যে বুড়ী তার উনআশী বছরের শুক্‌নো হাড় গোড় নিয়ে বাস ক'রে আছে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? পেলে এতক্ষণ ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌তে।

একলা ঘরের মধ্যে মনে হ'লেও ত আজও লজ্জায় মর্‌তে ইচ্ছা করে; তবে এ কলঙ্কের কালি কাগজের উপর ঢেলে দেবার আমার কি আবশ্যক ছিল! সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটাই ত আজ আমাকে বল্‌তে হবে। নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে?

সব মেয়ের মত আমিও ত আমার স্বামীকে বিয়ের মন্ত্রের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম। তবু কেন তাতে আমার মন উঠল না। তাই যে-

দামটা আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি বড় শত্রুর জন্যেও তা একদিনের জন্যে কামনা করিনি! কিন্তু দাম আমাকে দিতে হ'ল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে একবিন্দু রেহাই দিলেন না। কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় ক'রে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে যখন আমাকে পথে বার ক'রে দিলেন, লজ্জা-সরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখ্‌লেন না, তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্ব্বনাশী, এ তুই ক'রেছিস্ কি? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন না একদিন তোর ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাঁকে যে তোর পেতেই হবে। এ জন্মে হোক্, আগামী জন্মে হোক্, কোটি জন্ম পরে হোক্ তাঁকে যে তোর চাই-ই। তুই যে তাঁরই।

জানি, যা হারিয়েছি, তার অনন্ত গুণ আজ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু তবু যে এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে, এটা আমার নারী দেহ। আজ আমার আনন্দ রাখবারও জায়গা নেই, কিন্তু ব্যথা রাখবারও যে ঠাঁই দেখি না প্রভু! এ দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু যে অহরাত্র কাঁদচে—ওরে অস্পৃশ্যা, ওরে পতিতা, আমাদের আর বেঁধে পোড়াস্‌নে, আমাদের ছুটি দে, আমরা একবার ম'রে বাঁচি!

কিন্তু থাক্ সে কথা।

বাবা মারা গেলেন, এক বছরের মেয়ে নিয়ে মা বাপের বাড়ী চ'লে এলেন। মামার ছেলেপিলে ছিল না, তাই গরীবের ঘর হ'লেও আমার আদর যত্নের কোন ত্রুটি হ'ল না, বড় বয়স পর্য্যন্ত তাঁর কাছে ব'সে ইংরাজী বাংলা কত বই না আমি পড়েছিলুম।

কিন্তু মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর-দেবতা কিছুই মান্‌তেন না। বাড়ীতে একটা পূজা-অর্চ্চনা কি বার-ব্রতও কোন দিন হ'তে দেখিনি, এ সব তিনি দুচক্ষে দেখতে পার্‌তেন না।

নাস্তিক বই কি ? মামা মুখে বলতেন বটে তিনি দিয়ে মামার মুখপানে সেও ত একটা মস্ত ফাঁকি ! কথাটা যিনি প্রথম আবিষ্কার বয়সে এত বড় তিনি ত শুধু লোকের চোখে ধূলো দেবার জন্যই নিজেদের আ কি আপনি ফাঁকির পিছনে আর একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ফাঁকি জুড়ে। আত্মরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তখন কি ছাই এসব বুঝেছিলুম ! আসল কথা হচ্চে, সূয্যির চেয়ে বালির তাতেই গায়ে বেশি ফোস্কা পড়ে। আমার মামারও হ'য়েছিল ঠিক সেই দশা।

শুধু আমার মা বোধ করি যেন লুকিয়ে ব'সে কি সব করতেন। সে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পেত না। তা, মা যা খুসি করুন আমি কিন্তু মামার বিদ্যে ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা শিখে নিয়েছিলুম।

আমার বেশ মনে পড়ে, দোরগোড়ায় সাধু সন্ন্যাসীরা এসে দাঁড়ালে সঙ্ দেখবার জন্যে ছুটে গিয়ে মামাকে ডেকে আনতুম। তিনি তাদের সঙ্গে এমনি ঠাট্টা সুরু ক'রে দিতেন যে, বেচারারা পালাবার পথ পেত না। আমি হেসে হাততালি দিয়ে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়তুম। এমনি ক'রেই আমাদের দিন কাটছিল।

শুধু মা এক-একদিন ভারি গোল বাধাতেন। মুখ ভার ক'রে এসে বলতেন, দাদা, সদুর ত দিন দিন বয়স হচ্চে এখন থেকে একটু খোঁজা-খুঁজ না করলে সময়ে বিয়ে দেবে কি ক'রে !

মামা আশ্চর্য্য হ'য়ে বলতেন, বলিস্ কি গিরি, তোর মেয়ে ত এখনো বারো পেরোয়নি, এর মধ্যেই তোর—সাহেবদের মেয়েরা ত এ বয়সে—

মা কাঁদ কাঁদ গলায় জবাব দিতেন, সাহেবদের কথা কেন তুলচ দাদা, আমরা ত সত্যিই আর সাহেব নই ! ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া করতে আসচেন না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সমাজ ত আছে ? তাকে উড়িয়ে দেবে কি ক'রে ?

·্তেন, ভাবিস্‌নে বোন, সে সব আমি জানি। এই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি, ঠিক্ এম্‌নি ক'রে আমাদের নচ্ছার .কও হেসে উড়িয়ে দেব।

মা মুখ ভার ক'রে বিড়্ বিড়্ ক'রে বক্‌তে বক্‌তে উঠে যেতেন। মামা গ্রাহ্য কর্‌তেন না বটে, কিন্তু আমার ভারি ভয় হ'ত। কেমন ক'রে যেন বুঝ্‌তে পারতুম, মামা যাই বলুন, মার কাছ থেকে আমাকে তিনি রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না।

কেন যে বিয়ের কথায় ভয় হ'তে সুরু হয়েছিল, তা বল্‌চি। আমাদের পশ্চিম-পাড়ার বুক চিরে যে নালাটা গ্রামের সমস্ত বর্ষার জল নদীতে ঢেলে দিত, তার দুপাড়ে যে দুঘরের বাস ছিল, তার এক ঘর আমরা, অন্য ঘর গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদার। এই মজুমদার বংশ যেমন ধনী তেমনি দুর্দান্ত। গাঁয়ের ভেতরে-বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না। নরেন ছিল এই বংশের একমাত্র বংশধর।

আজ এত বড় মিথ্যেটা মুখে আন্‌তে আমার যে কি হচ্চে, সে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জান্‌বে বল, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম, এ বুঝি, সত্যি একটা জিনিস—সত্যি বুঝি নরেনকে ভালবাসি।

কবে যে এই মোহটা প্রথম জন্মেছিল, সে আমি বল্‌তে পারি না। কল্‌কাতায় সে বি-এ পড়ত, কিন্তু ছুটির সময় বাড়ী এলে মামার সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা করতে প্রায়ই আস্‌ত। তখনকার দিনে 'Agnosticism'ই ছিল বোধকরি লেখাপড়া-জানাদের ফ্যাস্যান! এই নিয়েই বেশিভাগ তর্ক হ'ত। কতদিন মামা তাঁর গৌরব দেখাবার জন্য নরেনবাবুর তর্কের জবাব দিতে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কতদিন সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত্রি হয়ে যেত, দুজনের তর্কের কোন মীমাংসা হ'ত না। কিন্তু আমিই প্রায় জিত্‌তুম, তার কারণও আজ আর আমার অবিদিত নেই।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে মামার মুখপানে চেয়ে গভীর বিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌ত, আচ্ছা ব্রজবাবু, এই বয়সে এত বড় লজিকের জ্ঞান, তর্ক করবার এমন একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি আপনি একটা ফিনোমিনন ব'লে মনে করেন না?

আমি গর্ব্বে, সৌভাগ্যে ঘাড় হেঁট করতুম। ওরে হতভাগী! সেদিন ঘাড়টা তোর চিরকালের মত একেবারে ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি কেন?

মামা উচ্চ-অঙ্গের একটু হাস্য ক'রে বল্‌তেন, কি জান নরেন, এ শুধু শেখাবার ক্যাপাসিটি।

কিন্তু তর্কাতর্কি আমার তত ভাল লাগ্‌ত না, যত ভাল লাগ্‌ত তার মুখের মন্টিক্রিষ্টোর গল্প। কিন্তু গল্পও আর শেষ হ'তে চায় না, আমার অধৈর্য্যের ও আর সীমা পাওয়া যায় না। সকালে ঘুম ভেঙে পর্য্যন্ত সারাদিন একশবার মনে করতুম, কখন বেলা পড়বে, কখন নরেনবাবু আসবে।

এম্‌নি তর্ক ক'রে আর গল্প শুনে আমার বিয়ের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোর শেষে গড়িয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে আমার হ'ল না।

তখন বর্ষার নবযৌবনের দিনে মজুমদারদের বাগানের একটা মস্ত বকুল-গাছের তলা, ঝরা ফুলে ফুলে একেবারে বোঝাই হ'য়ে যেত। আমাদের বাগানের ধারের সেই নালাটা পার হ'য়ে আমি রোজ গিয়ে কুড়িয়ে আন্‌তুম্। সেদিন বিকালেও, মাথার উপর গাঢ় মেঘ উপেক্ষা ক'রেই দ্রুতপদে যাচ্চি, মা দেখ্‌তে পেয়ে বললেন, ওলো ছুটে ত যাচ্ছিস্, জল যে এলো ব'লে।

আমি বল্‌লুম, জল এখন আস্‌বে না মা, ছুটে গিয়ে দুটো কুড়িয়ে আনি।

মা বল্‌লেন, পোনের মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নাম্‌বে সদু, কথা শোন্— যাস্‌নে। এই অবেলায় ভিজে গেলে ঐ চুলের বোঝা আর শুকোবে না তা ব'লে দিচ্চি।

আমি বল্‌লুম, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, যাই। বৃষ্টি এসে পড়্‌লে মালিদের এই চালাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব। বল্‌তে বল্‌তে ছুটে পালিয়ে গেলুম। মায়ের আমি একটি মেয়ে, দুঃখ দিতে আমাকে কিছুতেই পার্‌তেন না। ছেলে-বেলা থেকেই ফুল যে কত ভালবাসি, সে ত তিনি নিজেও জান্‌তেন, তাই চুপ ক'রে রইলেন। কতদিন ভাবি, সেদিন যদি হতভাগীর চুলের মুঠি ধ'রে টেনে আন্‌তে মা, এমন ক'রে হয়ত তোমার মুখ পোড়াতুম না।

বকুল ফুলে কোঁচড় প্রায় ভর্ত্তি হয়ে এসেছে, এমন সময় মা যা বল্‌লেন, তাই হ'ল। ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি এল। ছুটে গিয়ে মালীদের চালার মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম। কেউ নেই, খুঁটি ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের পানে চেয়ে ভাবচি, ঝম্ ঝম্ ক'রে ছুটে এসে কে ঢুকে পড়্‌ল। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি—ওমা! এ যে নরেনবাবু! কলকাতা থেকে তিনি যে বাড়ী এসেছেন, কৈ সে ত আমি শুনিনি।

আমাকে দেখে চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, অ্যাঁ, সদু যে! এখানে?

অনেক দিন তাঁকে দেখিনি, অনেক দিন তাঁর গলা শুনিনি, আমার বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। কান পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল, মুখের পানে চেয়ে ত জবাব দিতে পারলুম না, মাটীর দিকে চেয়ে বল্‌লুম, আমি ত রোজই ফুল কুড়ুতে আসি। কবে এলেন?

নরেন মালীদের একটা ভাঙ্গা খাটিয়া টেনে নিয়ে ব'সে বল্‌লে, আজ সকালে। কিন্তু তুমি কার হুকুমে ফুল চুরি কর শুনি?

গম্ভীর গলায় আশ্চর্য্য হয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি চোখ দুটো তার চাপা হাসিতে নাচচে।

লজ্জা! লজ্জা! এই পোড়ার মুখেও কোথা থেকে হাসি এসে পড়ল, আমি বল্‌লুম, তাই বই কি! কষ্ট ক'রে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নরেন ফস্ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, আর আমি যদি ঐ কুড়ান ফুলগুলো তোমার কোঁচড়ের ভেতর থেকে আর একবার কুড়িয়ে নিই, তাকে কি বলে ?

জানিনে, কেন আমার ভয় হ'ল, সত্যিই যেন এইবার সে এসে আমার আঁচল চেপে ধরবে। হাতের মুঠা আমার আল্গা হ'য়ে গিয়ে চোখের পলকে সমস্ত ফুল ঝপ ক'রে মাটীতে পড়ে গেল।

ও কি করলে ?

আমি কোনমতে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লুম, আপনাদেরই ত ফুল, বেশ ত, নিন না কুড়িয়ে।

এঁ্যা! এত অভিমান! ব'লে সে উঠে আমার আঁচলটা টেনে নিয়ে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখতে লাগল। কেন জানিনে, হঠাৎ আমার দুচোখ জলে ভ'রে গেল, আমি জোর ক'রে মুখ ফিরিয়ে আর একদিকে চেয়ে রইলুম।

সমস্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমার আঁচলে একটা গেরো দিয়ে, নরেন তার জায়গায় ফিরে গেল। খানিকক্ষণ আমার পানে চুপ ক'রে চেয়ে থেকে বল্লে, যে ঠাট্টা বুঝতে পারে না, এত অল্পে রাগ করে, তার ফিলজফি পড়া কেন ? আমি কালই গিয়ে ব্রজবাবুকে ব'লে দেব, তিনি আর যেন পণ্ডশ্রম না করেন।

আমি আগেই চোখ মুছে ফেলেছিলুম, বললুম কে রাগ করেছে ?

যে ফুল ফেলে দিলে ?

ফুল ত আপনি পড়ে গেল।

মুখখানাও বুঝি আপনি ফিরে আছে ?

আমি ত মেঘ দেখছি।

মেঘ বুঝি এ দিকে ফিরে দেখা যায় না ?

কৈ যায়? ব'লে আমি ভুলে হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দুজনের চোখো-চোখি হ'য়ে গেল। নরেন ফিক্ ক'রে হেসে বল্‌লে, একখানা আরসি থাক্‌লে যায় কি না, দেখিয়ে দিতুম। নিজের মুখে চোখেই একসঙ্গে মেঘ-বিদ্যুৎ দেখতে পেতে; কষ্ট ক'রে আকাশে খুঁজতে হ'ত না।

আমি তখন চোখ ফিরিয়ে নিলুম। রূপের প্রশংসা আমি ঢের শুনেছি, কিন্তু নরেনের চাপা হাসি, চাপা ইঙ্গিত, সেদিন আমার বুকের মধ্যে ঢুকে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন সজোরে দুলিয়ে দিলে। এই ত সেই পাঁচ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হয়, সে সৌদামিনী বুঝি বা আর কেউ ছিল।

নরেন বল্‌লে, মেঘ কাটলে ব্রজবাবুকে ব'লে দেব, লেখা-পড়া শেখান মিছে! তিনি আর যেন কষ্ট না করেন।

আমি বল্‌লুম, বেশ ত, ভালই ত। আমি ওসব পড়তেও চাইনে, বরং গল্পের বই পড়তেই আমার ঢের ভাল লাগে।

নরেন হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল, দাঁড়াও ব'লে দিচ্ছি, আজ কাল নভেল পড়া হচ্চে বুঝি?

আমি বল্‌লুম, গল্পের বই তবে আপনি নিজে পড়েন কেন?

নরেন বল্‌লে, সে শুধু তোমাকে গল্প বল্‌বার জন্যে। নইলে পড়তুম না। বৃষ্টির দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা, এ জল যদি আজ না থামে? কি কর্‌বে?

বল্‌লুম, ভিজে ভিজে চ'লে যাব।

আচ্ছা, এ যদি আমাদের পাহাড়ী বৃষ্টি হ'ত, তা হ'লে?

গল্প জিনিসটা চিরদিন কি ভালই বাসি! একটুখানি গন্ধ পাবামাত্র আমার চোখের দৃষ্টি একমুহূর্ত্তে আকাশ থেকে নরেনের মুখের উপর নেমে এলো। জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললুম, সে দেশের বৃষ্টির মধ্যে বুঝি বেরোনো যায় না?

নরেন বল্‌লে একেবারে না। গায়ে তীরের মত বেঁধে।

আচ্ছা, তুমি সে বৃষ্টি দেখেচ? পোড়া মুখ দিয়ে তুমি বার হ'য়ে গেল। ভাবি, জিভটা সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখ থেকে খ'সে প'ড়ে যেত!

সে বল্‌লে, এর পর যদি একজন আপনি ব'লে ডাকে, সে আর একজনের মরা-মুখ দেখবে।

কেন দিব্যি দিলেন? আমি ত কিছুতেই তুমি বল্‌ব না।

বেশ, তা হ'লে মরা-মুখ দেখো।

দিব্যি কিছুই না। আমি মানিনে।

কেমন মান না, একবার আপনি বলে প্রমাণ করে দাও।

মনে মনে রাগ ক'রে বল্‌লুম, পোড়ামুখী মিছে তেজ তোর রইল কোথায়? মুখ দিয়ে ত কিছুতে বার করতে পার্‌লিনে। কিন্তু দুর্গতির যদি ঐখানেই সেদিন শেষ হয়ে যেত!

ক্রমে আকাশের জল থাম্‌ল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জলে সমস্ত দুনিয়াটা যেন ঘুলিয়ে একাকার ক'রে দিলে। সন্ধ্যা হয় হয়। ফুল কটি আঁচলে বাঁধা, কাদা-ভরা বাগানের পথে বেরিয়ে পড়্‌লুম।

নরেন বল্‌লে, চল, তোমাকে পৌঁছে দি।

আমি বল্‌লুম, না।

মন যেন বলে দিলে, সেটা ভাল না। কিন্তু অদৃষ্টকে ডিঙিয়ে যাব কি ক'রে? বাগানের ধারে এসে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। সমস্ত নালাটা জলে পরিপূর্ণ। পার হই কি করে?

নরেন সঙ্গে আসেনি, কিন্তু সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল। আমাকে চুপ ক'রে দাঁড়াতে দেখে, অবস্থাটা বুঝে নিতে তার দেরী হ'ল না। কাছে এসে বল্‌লে, এখন উপায়?

আমি কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌লুম, নালায় ডুবে মরি, সেও আমার

ভাল, কিন্তু একলা অতদূর সদর রাস্তা ঘুরে আমি কিছুতেই যাব না। মা দেখ্‌লে—

কথাটা আমি শেষ কর্‌তেই পার্‌লুম না।

নরেন হেসে বল্‌লে, তার আর কি, চল তোমাকে সেই পিটুলি গাছটার উপর দিয়ে পার ক'রে দিই।

তাই ত বটে! আহ্লাদে মনে মনে নেচে উঠলুম। এতক্ষণ আমার মনে পড়ে নি যে খানিকটা দূরে একটা পিটুলি গাছ বহুকাল থেকে ঝড়ে উপড়ে নালার ওপর ব্রিজের মত প'ড়ে আছে। ছেলে-বেলায় আমি নিজেই তার উপর দিয়ে এপার ওপার হয়েচি।

খুসী হয়ে বল্‌লুম, তাই চল—

নরেন তার চেয়েও খুসী হয়ে বল্‌লে, কেমন মিষ্টি শোনাল বল ত!

বল্‌লুম, যাও—

সে বললে, নির্ব্বিঘ্নে পার না ক'রে দিয়ে কি আর যেতে পারি।

বল্‌লুম, তুমি কি আমার পারের কাণ্ডারী?

আমি আজও ভেবে পাইনি, এ কথা কি ক'রেই বা মনে এল এবং কেমন ক'রেই বা মুখ দিয়ে বার কর্‌লুম। কিন্তু সে যখন আমার মুখ-পানে চেয়ে একটু হেসে বল্‌লে, দেখি তাই যদি হ'তে পারি—আমি ঘেন্নায় যেন মরে গেলুম!

সেখানে এসে দেখি, পার হওয়া সোজা নয়। একে ত স্থানটা গাছের ছায়ায় অন্ধকার, তাতে পিটুলি গাছটাই জলে ভিজে ভিজে যেমন পিছল, তেমনই উঁচু নীচু হয়ে আছে। তলা দিয়ে সমস্ত বৃষ্টির জল হু হু শব্দে বয়ে যাচ্ছে, আমি একবার পা বাড়াই, একবার টেনে নিই! নরেন খানিকক্ষণ দেখে বল্‌লে, আমার হাত ধরে যেতে পার্‌বে?

বল্‌লুম, পার্‌ব। কিন্তু তার হাত ধরে এম্‌নি কাণ্ড কর্‌লুম যে,

সে কোন মতে টাল্ সাম্‌লে এ দিকে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করলে। কয়েক মুহূর্ত্ত সে চুপ ক'রে আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দুটো যেন ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠল। বল্লে, দেখবে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হ'তে পারি কি না?

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম, কি ক'রে?

এম্‌নি ক'রে, বলেই সে নত হয়ে আমার দুই হাঁটুর নিচে এক হাত, ঘাড়ের নিচে অন্য হাত দিয়ে চোখের নিমিষে তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধর্‌লুম। নরেন দ্রুতপদে পার হ'য়ে এপারে চ'লে এল। কিন্তু নামাবার আগে, আমার ঠোঁট দুটোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু থাক্ গে। কম ঘেন্নায় কি আর এ দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি দিতে চায়!

শিউরুতে শিউরুতে বাড়ী চ'লে এলুম, ঠোঁট দুটো তেম্‌নি জলতেই লাগল বটে কিন্তু সে জ্বালা লঙ্কামরিচখোরের জলুনির মত যত জল্‌তে লাগল জ্বালার তৃষ্ণা তত বেড়ে যেতেই লাগল।

মা বল্‌লেন, ভালো মেয়ে তুই সদু, এলি কি ক'রে? নালাটা ত জলে জলমগ্ন হয়েছে দেখে এলুম। সেই গাছটার ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি? প'ড়ে মর্‌তে পার্‌লিনে।

না মা, সে পুণ্য থাক্‌লে আর এ গল্প লেখবার দরকার হবে কেন?

তার পরদিন নরেন, মামার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এল। আমি সেই-খানেই বসেছিলুম, তার পানে চাইতে পারলুম না, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যে চোরাবালির মত আমার পা দুটোকে একটু একটু ক'রে গিলতে লাগল, আমি নড়তেও পারলুম না, মুখ তুলে দেখতেও পারলুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হ'ল, তা শয়তানই জানে, অনেক দিন পর্য্যন্ত আর সে কল্‌কাতায় গেল না। রোজই দেখা হ'তে লাগল। মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হ'য়ে আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, ওদের পুরুষমানুষদের লেখাপড়ার কথাবার্ত্তা হয়, তুই তার মধ্যে হাঁ ক'রে ব'সে কি শুনিস্ বল্ ত? যা, বাড়ীর ভেতরে যা। এত বড় মেয়ের যদি লজ্জা সরম একটুকু আছে।

এক-পা এক-পা ক'রে আমার ঘরে চ'লে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পারতুম না। যতক্ষণ সে থাকৃত তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টান্‌তে থাকৃত।

আমার মামা আর যাই হোন, তাঁর মনটা প্যাঁচালো ছিল না। তা ছাড়া, লিখে প'ড়ে তর্ক ক'রে ভগবানকে উড়িয়ে দেবার ফন্দিতেই শুদ্ধ অন্তঃকরণটা তাঁর এমনি অনুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘটচে তা দেখ্‌তে পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেছি, জগতের সব চেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলোই হচ্চে সব চেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানের যে লীলার অন্ত নেই। তিনি যে এই 'না' রূপেই তাদের পোনর আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় নাই, সপ্রমাণ হোক্ অপ্রমাণ হোক্, তাঁর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, সংসারের মানুষগুলো কি বোকা! তারা সকাল-সন্ধ্যায় ব'সে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে! আমার মামারও ছিল সেই দশা! তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। কিন্তু মা ত তা নয়। তিনি যে আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ ছিল না! আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ ক'রেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের দুজনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জান্‌তেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার

বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠ্ত, তাই ভাবনার এই বিশ্রী দিকটাকে আমি দুহাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলেচি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হ'লে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না! নির্জ্জলা বিষের আগুনে কল্জে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ।

আর একটা জিনিস আমি কিছুতেই ভুল্তে পারতুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বর্য্যের চেহারা। ছেলে-বেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘর-দোর, ছবি-দেয়ালগিরি, আলমারি, সিন্দুক, আসবাব-পত্রের সঙ্গে কোন্ একটা ভাবী ছোট এক-তালা শ্বশুরবাড়ীর কদাকার মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে মনে মনে আমি যেন শিউরে উঠতুম।

মাস-খানেক পরে একদিন সকাল-বেলা নদী থেকে স্নান ক'রে বাড়ীতে পা দিয়েই দেখি, বারান্দার ওপর একজন প্রৌঢ়-গোছের বিধবা স্ত্রীলোক মায়ের কাছে ব'সে গল্প কর্‌চে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, এইটি বুঝি মেয়ে?

মা ঘাড নেডে বললেন, হাঁ মা, আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গডন, নইলে—

স্ত্রীলোকটি হেসে বল্লে, তা হোক্, ছেলেটির বয়সও প্রায় ত্রিশ, দুজনের মানাবে ভাল। আর ঐ শুন্তেই দোজবরে নইলে যেন কার্ত্তিক।

আমি দ্রুতপদে ঘরে চ'লে গেলুম। বুঝলুম, ইনি ঘটকঠাকরুণ, আমার সম্বন্ধ এনেছেন।

মা চেঁচিয়ে বললেন, কাপড ছেড়ে একবার এসে ব'স মা।

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুন্‌তে লাগ্‌লুম। বুকের কাঁপুনি যেন আর থামতে চায় না।

শুনতে পেলুম, চিতোর গ্রামের কে একজন রাধাবিনোদ মুখুয্যের ছেলে ঘনশ্যাম। পোড়াকপালে নাকি অনেক দুঃখ ছিল, তাই আজ যে নাম জপের মন্ত্র, সে নাম শুনে সেদিন গা জ্বলে যাবে কেন?

শুনলুম, বাপ নেই, কিন্তু মা আছেন। ছোট দুটি ভাই, এক ভায়ের বিয়ে হ'য়েছে, একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই ঘাড়ে, তাই এনট্রান্স পাশ ক'রেই রোজগারের ধান্দায় পড়া ছাড়তে হ'য়েছে। ধান, চাল, তিসি, পাট প্রভৃতির দালালি ক'রে, উপায় মন্দ করেন না। তাঁরই উপর সমস্ত নির্ভর। তা ছাড়া ঘরে নারায়ণ শিলা আছেন, দুটো গরু আছে, বিধবা বোন আছে—নেই কি?

নেই শুধু সংসারের বড়বৌ। সাত বছর আগে বিয়ের এক মাসের মধ্যেই তিনি মারা যান, তারপর এতদিন বাদে এই চেষ্টা। সাত বছর! ঘটকীকে উদ্দেশ ক'রে মনে মনে বললুম, পোড়ারমুখী, এতদিন কি তুই শুধু আমার মাথা খেতেই চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিলি?

মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বসলুম। সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বললে, মেয়ে পছন্দ হয়েচে, এখন দিন স্থির করলেই হ'ল। মায়ের চোখ দুটিতে জল টল টল করতে লাগল, বললেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা, আর কি বলব!

মামা শুনে বললেন, এনট্রান্স? তবে ব'লে পাঠা, এখন বছর-দুই সতুর কাছে ইংরিজি প'ড়ে যাক্, তবে বিয়ের কথা কওয়া যাবে।

মা বললেন, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত ক'রো না, এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। দিতে থুতে কিছু হবে না—

মামা বললেন, তা হ'লে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় :দিগে যা, সেও এক পয়সা চাইবে না।

মা বললেন, পনেরয় পা দিলে যে—

মামা বল্‌লেন, তা ত দেবেই পোনের বছর বেঁচে রয়েছে যে।

মা রাগে দুঃখে কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্‌লেন, তুমি কি ওর তরে বিয়ে দেবে না দাদা? এর পর একেবারেই পাত্র জুটবে না।

মামা বল্‌লেন, সেই ভয়ে ত আগে থেকে ওকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না।

মা বল্‌লেন, ছেলেটিকে একবার নিজের চোখে দেখে এস না দাদা, পছন্দ না হয়, না দেবে।

মামা বল্‌লেন, সে ভাল কথা। রবিবার যাবো ব'লে চিঠি লিখে দিচ্চি।

ভাড়চির ভয়ে কথাটা মা গোপনে রেখেছিলেন এবং মামাকেও সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি জান্‌তেন না, এমন চোখ-কানও ছিল, যাকে কোন সতর্কতা ফাঁকি দিতে পারে না।

বাগানে এক টুক্‌রো শাকের ক্ষেত করেছিলুম। দিন-দুই পরে দুপুর-বেলা একটা ভাঙা খুন্‌তি দিয়ে তার ঘাস তুল্‌চি, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি, নরেন। তার সে রকম মুখের চেহারা অনেক দিন পরে আর একবার দেখেছিলুম সত্যি, কিন্তু আগে কখনও দেখিনি। বুকে এমন একটা ব্যথা বাজ্‌ল যা কখন কোন দিন পাইনি। সে বল্‌লে, আমাকে ছেড়ে কি সত্যিই চল্‌লে?

কথাটা বুঝেও যেন বুঝ্‌তে পারলুম না। ব'লে ফেল্‌লুম, কোথায়?

সে বল্‌লে, চিতোর।

স্পষ্ট হ'বামাত্রই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল, কোন উত্তর মুখে এল না।

সে পুনরায় বল্‌লে, তাই আমিও বিদায় নিতে এসেছি; বোধ হয় জন্মের মতই। কিন্তু তার আগে দুটো কথা বল্‌তে চাই—শুনবে?

বল্‌তে বল্‌তেই তার গলাটা যেন ধ'রে গেল। তবুও আমার মুখে কথা

যোগাল না—কিন্তু মুখ তুলে চাইলুম। এ কি? দেখি, তার দুচোখ ব'য়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়ছে।

ওরে পতিত! ওরে দুর্ব্বল নারী। মানুষের চোখের জল সহ্য কর্‌বার ক্ষমতা ভগবান তোকে যখন একেবারে দেননি, তখন তোর আর সাধ্য ছিল কি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমারও চোখের জলে বুক ভেসে গেছে। নরেন কাছে এসে কোঁচার খুঁট দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাত ধ'রে বললে, চল, ওই গাছটার তলায় গিয়ে বসিগে,এখানে কেউ দেখ্‌তে পাবে।

মনে বুঝ্‌লুম, এ অন্যায়, একান্ত অন্যায়! কিন্তু তখনও যে তার চোখের পাতা ভিজে, তখনও যে তার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভরা।

বাগানের একপ্রান্তে একটা কাঁটালি-চাঁপার কুঞ্জ ছিল, তার মধ্যে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটা ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুর্ দুর্ কর্‌ছিল, কিন্তু সে নিজেই দূরে গিয়ে ব'সে বল্‌লে, এই একান্ত নির্জ্জন স্থানে তোমাকে ডেকে এনেছি বটে, কিন্তু তোমাকে আমি ছোঁব না। এখনও তুমি আমার হওনি।

তার শেষ কথায় আবার পোড়া চোখে জল এসে পড়্‌ল। আঁচলে চোখ মুছে মাটীর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম।

তার পর অনেক কথাই হ'ল কিন্তু থাক্‌গে সে সব। আজও ত প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্য্যন্ত মনে করতে পারি, মরণেও যে বিস্মৃতি আস্‌বে, সে আশা কর্‌তেও যেন ভরসা হয় না; একটা কারণে আমি আমার এত বড় দুর্গতিতেও কোন দিন বিধাতাকে দোষ দিতে পারিনি। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার চিত্তের মাঝে থেকে নরেনের সংস্রব তিনি কোন দিন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি। সে যে আমার জীবনে কত বড় মিথ্যে, এ ত তাঁর অগোচর ছিল না। তাই তার প্রণয়-নিবেদনের মুহূর্ত্তের উত্তেজনা পরক্ষণের কত বড় অবসাদে যে ডুবে

যেত, সে আমি ভুলিনি! যেন কার কত চুরি-ডাকাতি সর্ব্বনাশ ক'রে ঘরে ফিরে এলুম, এম্‌নি মনে হ'ত। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল যে, অন্তর্য্যামীর এত বড় ইঙ্গিতেও আমার হুঁস হয়নি। হবেই বা কি ক'রে? কোন দিন ত শিখিনি যে, ভগবান মানুষের বুকের মধ্যেও বাস করেন। এই সবই তাঁরই নিষেধ।

মামা পাত্র দেখ্‌তে যাত্রা করলেন। যাবার সময় কতই না ঠাট্টা-তামাসা ক'রে গেলেন। মা মুখ চুণ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বেশ বুঝলেন, এ যাত্রা পণ্ডশ্রম। পাত্র তাঁর কিছুতেই পছন্দ হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ফিরে এসে আর বড় ঠাট্টা বিদ্রূপ করলেন না। বল্‌লেন, হাঁ, ছেলেটি পাশ-টাস তেমন কিছু কর্‌তে পারেনি বটে, কিন্তু মুখ্যু ব'লেও মনে হ'ল না। তা ছাড়া নম্র, বড় বিনয়ী। আর একটা কি জানিস গিরি, ছেলেটির মুখের ভাবে কি একটু আছে, ইচ্ছে হয়, ব'সে ব'সে আরও দুদণ্ড আলাপ করি।

মা আহ্লাদে মুখখানি উজ্জ্বল ক'রে বল্‌লেন, তবে আর আপত্তি ক'রো না দাদা, মত দাও—সদুর একটা কিনারা হ'য়ে যাক্‌।

মামা বল্‌লেন, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে নিরাশার আশাটুকু বুকে চেপে ধ'রে মনে মনে বল্‌লুম, যাক্‌, মামা এখনো মনস্থির কর্‌তে পারেননি। এখনও বলা যায় না। কিন্তু কে জান্‌ত, তাঁর ভাগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধে মতিস্থির কর্‌বার পূর্ব্বেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে মতিস্থির কর্‌বার ডাক এসে পড়বে। যাঁকে সারাজীবন সন্দেহ ক'রে এসেছেন, সে দিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর দূত এসে যখন একেবারে মামার শিয়রে দাঁড়াল, তখন তিনি চম্‌কে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও বড় কম চমক লাগ্‌ল না। মাকে কাছে ডেকে বল্‌লেন, আমি মত দিয়ে যাচ্ছি বোন্‌, সদুর সেইখানেই

বিয়ে দিস্। ছেলেটির যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে। মেয়েটা সুখে থাকবে। অবাক্ কাণ্ড! কিন্তু অবাক্ হলেন না শুধু মা। নাস্তিকতা তিনি দুচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তেন না। তাঁর ধারণা ছিল, মরণকালে সবাই ঘুরে ফিরে হরি বলে। তাই তিনি বল্‌তেন, মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যত ভালই বাসুক না কেন, নির্ভর কর্‌বার বেলায় করে শুধু তাকে, যে মদ খায় না! জানি না, কথাটা কতখানি সত্যি।

হৃদরোগে মামা মারা গেলেন, আমরা পড়লুম অকূল-পাথারে। সুখে দুঃখে কিছু দিন কেটে গেল বটে, কিন্তু যে বাড়ীতে অবিবাহিতা মেয়ের বয়স পোনর পার হ'য়ে যায়, সেখানে আলস্যভরে শোক কর্‌বার সুবিধা থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে ব'সে আবার কোমর বেঁধে লাগলেন।

অবশেষে অনেক দিন অনেক কথা-কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন যখন সত্যিই আমার বুকে এসে বিঁধল, তখন বয়সও ষোল পার হ'য়ে গেল। তখনও আমি প্রায় এম্‌নিই লম্বা। আমার এই দীর্ঘ দেহটার জন্য জননীর লজ্জা ও কুণ্ঠার অবধি ছিল না। রাগ ক'রে প্রায়ই ভর্ৎসনা করতেন, হতভাগা মেয়েটার সবই সৃষ্টিছাড়া। একে ত বিয়ের কনের পক্ষে সতের বছর একটা মারাত্মক অপরাধ, তার উপর এই দীর্ঘ গড়নটা যেন তাকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ সে রাতটার জন্যও যদি আমাকে কোন রকম মুচড়ে মাচড়ে একটু খাট ক'রে তুলতে পারতেন, মা বোধ করি তাতেও পেছুতেন না। কিন্তু সে ত হবার নয়। আমি আমার স্বামীর বুক ছাড়িয়ে একেবারে দাড়ির কাছে গিয়ে পৌছলুম।

কিন্তু শুভদৃষ্টি হ'ল না, আমি ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণায় চোখ বুজে রইলুম। কিন্তু তাও বলি, এমন কোন অসহ্য মর্ম্মান্তিক দুঃখও তখন আমি মনের মধ্যে পাইনি।

ইতিপূর্ব্বে কত দিন সারারাত্রি জেগে ভেবেছি, এমন দুর্ঘটনা

যদি সত্যিই কপালে ঘটে, নরেন এসে আমাকে না নিয়ে যায়, তবু আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে কোন মতেই হ'তে পারবে না! সে রাত্রে নিশ্চয় আমার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে, ধরাধরি ক'রে আমাকে বিবাহ-সভা থেকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হবে, এ বিশ্বাস আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়েছিল! কিন্তু কৈ কিছুই ত হ'ল না। আরও পাঁচজন বাঙ্গালীর মেয়ের যেমন হয় শুভকর্ম্ম তেমনি ক'রে আমারও সমাধা হয়ে গেল এবং তেমনি ক'রেই একদিন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করলুম।

শুধু যাবার সময়টিতে পাল্কীর ফাঁক দিয়ে সেই কাঁটালী-চাঁপার কুঞ্জটায় চোখ পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কত দিনের কত চোখের জল, কত দিব্যি-দিলাশার নীরব সাক্ষী।

আমার চিতোর গ্রামের সম্বন্ধটা যে দিন পাকা হ'য়ে গেল, ওই গাছটার আড়ালে বসেই অনেক অশ্রু-বিনিময়ের পর স্থির হয়েছিল, সে এসে একদিন আমাকে নিয়ে চ'লে যাবে। কেন, কোথায় প্রভৃতি বাহুল্য প্রশ্নের তখন আবশ্যক হয়নি।

আর কিছু না, শুধু যাবার সময় একবার যদি দেখা হ'ত! কেন সে আমাকে আর চাইলে না, কেন আর একটা দিনও দেখা দিলে না, শুধু যদি খবরটা পেতুম।

শ্বশুরবাড়ী গেলুম, বিয়ের বাকি অনুষ্ঠানও শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি আমার স্বামীর ধর্ম্মপত্নীর পদে এইবার পাকা হয়ে বসলুম।

দেখলুম স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা শুধু একা আমার নয়। বাড়ীশুদ্ধ আমার দলে। শ্বশুড নেই, সৎ-শাশুড়ী তাঁর নিজের ছেলে দুটি, একটি বৌ এবং বিধবা মেয়েটি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এতদিন নিরাপদে সংসার করছিলেন, হঠাৎ একটা সতের-আঠার বছরের মস্ত বৌ দেখে তাঁর

সমস্ত মন সশস্ত্র জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু মুখে বললেন, বাঁচলুম বৌমা, তোমার হাতে সংসার ফেলে দিয়ে এখন দুদণ্ড ঠাকুরদের নাম করতে পাব। ঘনশ্যাম আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশি ; সে বেঁচে থাক্‌লেই তবে সব বজায় থাকবে, এইটি বুঝে শুধু কাজ কর মা, আর কিছু আমি চাইনে।

তাঁর কাজ তিনি করলেন, আমার কাজ আমি করলুম, বললুম, আচ্ছা। কিন্তু সে ওই কুস্তিগীরের তাল ঠোকার মত, প্যাঁচ মারতে যে দুজনেই জানি, তা ইসারায় জানিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কত শীঘ্র মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে চিনতে পারে, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁকে জানতে আমারও যেমন দেরি হ'ল না, আমাকেও দুদিনের মধ্যে চিনে নিয়ে তিনিও তেমনই আরামের নিশ্বাস ফেললেন, বেশ বুঝলেন, স্বামীর খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, খরচ-পত্র নিয়ে দিবারাত্র চক্র ধরে ফোঁস ফোঁস ক'রে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

মেয়েমানুষের তূণে যত প্রকার দিব্যাস্ত্র আছে, 'আড়ি-পাতা'টা ব্রহ্মাস্ত্র। সুবিধে পেলে এতে মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ, জা-ননদ, কেউ কাকে খাতির করে না। আমি ঠিক জানি, আমি যে পালঙ্কে না শুয়ে ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর টেনে নিয়ে সারা-রাত্রি প'ড়ে থাকতুম, এ সুসংবাদ তাঁর অগোচর ছিল না। আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হ'লে সেই দিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম, সেটা ভুল। ফাটবার চেরবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু তাই ব'লে একশয্যায় শুতেও আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হ'ল না।

দেখলুম, আমার স্বামীটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। আমার আচরণ নিয়ে তিনি কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন কথাই কইলেন না। অথচ মনে রাগ কিংবা অভিমান ক'রে আছেন, তাও না। শুধু একদিন একটু হেসে বললেন, ঘরে আর একটা খাট এনে বিছানাটা বড় ক'রে নিলে কি শুতে পার না?

আমি বল্‌লুম, দরকার কি, আমার ত এতে কষ্ট হয় না।

তিনি বল্‌লেন, না হ'লেও একদিন অসুখ করতে পারে যে।

আমি বল্‌লুম, তোমার এতই যদি ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার না?

তিনি বল্‌লেন, ছিঃ তা কি হয়? তাতে কত রকমের অপ্রিয় আলোচনা উঠ্‌বে।

বল্‌লুম, ওঠে উঠুক, আমি গ্রাহ্য করিনে।

তিনি একমুহূর্ত্ত চুপ ক'রে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বল্‌লেন, এত বড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাক্‌বে, এমন কি কথা আছে? ব'লে একটুখানি হেসে কাজে চ'লে গেলেন।

আমার মেজদেওর টাকা চল্লিশের মত কোথাও চাক্‌রী কর্‌তেন; কিন্তু একটা পয়সা কখনো সংসারে দিতেন না। অথচ তাঁর আফিসের সময়ের ভাত, আফিস থেকে এলে পা ধোবার গাড়ু-গামছা, জল-খাবার, পান তামাক ইত্যাদি যোগাবার জন্য বাড়ীশুদ্ধ সবাই যেন ত্রস্ত হয়ে থাক্‌ত। দেখ্‌তুম, আমার স্বামী, আমার মেজদেওর হয়ত কোন দিন একসঙ্গেই বিকেল-বেলায় বাড়ী ফিরে এলেন, সবাই তাঁর জন্যেই ব্যতিব্যস্ত; এমন কি চাকরটা পর্য্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন কর্‌বার জন্যে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে। তাঁর একতিল দেরি কিংবা অসুবিধা হ'লে যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। অথচ আমার স্বামীর দিকে কেউ চেয়েও দেখ্‌ত না। তিনি আধঘণ্টা ধ'রে হয় ত এক ঘটী জলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, সে দিকে গ্রাহ্যই নেই। অথচ এদের খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধের জন্যেই তিনি দিবা রাত্রি খেটে মর্‌চেন। ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাঁর যেন কিছুতেই শ্রান্তি নেই, কোন দুঃখই যেন তাঁকে পীড়া দিতে পারে না। এমন শান্ত, এত ধীর, এত বড় পরিশ্রমী

এর আগে কখনও আমি দেখিনি। আর চোখে দেখেচি ব'লেই লিখতে পারচি, নইলে শোনা কথা হ'লে বিশ্বাস করতেই পারতুম না, সংসারে এমন ভালমানুষও থাকতে পারে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সব তাতেই বলতেন, থাক্ থাক্ আমার এতেই হবে।

স্বামীর প্রতি আমার মায়াই ত ছিল না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণার ভাবই ছিল। তবু এমন একটা নিরীহ লোকের উপর বাড়ীশুদ্ধ সকলের এত বড অন্যায় অবহেলায় আমার গা যেন জ্বলে যেতে লাগ্‌ল।

বাড়ীতে গরুর দুধ বড কম হ'ত না। কিন্তু তাঁর পাতে কোন দিন বা একটু পড্‌ত কোনদিন পড্‌ত না। হঠাৎ একদিন সইতে না পেরে ব'লে ফেলেছিলুম আর কি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছি, ছি, কি নির্লজ্জই আমাকে তা হ'লে এরা মনে করত। তা ছাড়া এরা সব আপনার লোক হয়েও যদি দয়া-মায়া না করে, আমারই বা এত মাথা-ব্যথা কেন? আমি কোথাকার কে? পর বই ত না।

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সকাল-বেলা রান্নাঘরে ব'সে মেজঠাকুর-পোর জন্যে চা তৈরি করচি, স্বামীর কণ্ঠস্বর আমার কানে গেল। তাঁর সকালেই কোথায় বার হবার দরকার ছিল, ফিরতে দেরি হবে, মাকে ডেকে বললেন, কিছু খেয়ে গেলে বড ভাল হ'ত মা, খাবার টাবার কিছু আছে?

মা বললেন, অবাক্ করলে ঘনশ্যাম। এত সকালে খাবার পাব কোথায়?

স্বামী বললেন, তবে থাক্ ফিরে এসেই খাব। ব'লে চ'লে গেলেন।

সেদিন আমি কিছুতেই আপনাকে আর সামলাতে পারলুম না। আমি জানতুম, ও-পাড়ার বোসেরা তাদের বেয়াইবাড়ীর পাওয়া সন্দেশ রসগোল্লা পাড়ায় বিলিয়েছিল। কাল রাত্রে আমাদেরও কিছু দিয়েছিল।

শাশুড়ী ঘরে ঢুকতেই ব'লে ফেললুম, কালকের খাবার কি কিছুই ছিল না মা?

তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়ে বললেন, খাবার আবার কে কিনে আন্‌লে বৌমা?

বল্‌লুম, সেই যে বোসেরা দিয়ে গিয়েছিল?

তিনি বললেন, ও মা, সে আবার কটা যে, আজ সকাল পর্য্যন্ত থাক্‌বে? সে ত কালই শেষ হয়ে গেছে।

বললুম, তা ঘরেই কি কিছু খাবার তৈরি ক'রে দেওয়া যেত না মা?

শাশুড়ী বললেন, বেশ ত বৌমা, তাই কেন দিলে না? তুমি ত ব'সে ব'সে সমস্ত শুন্‌ছিলে বাছা?

চুপ ক'রে রইলুম। আমার কি-ই বা বলবার ছিল। স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার টান ত আর বাড়ীতে কারো অবিদিত ছিল না।

চুপ ক'রে রইলুম সত্যি, কিন্তু ভেতরে মনটা আমার জলতেই লাগল। দুপুর-বেলা শাশুড়ী ডেকে বললেন, খাবে এস বৌমা, ভাত বাড়া হয়েছে।

বললুম, আমি এখন খাব না, তোমরা খাও গে।

আমার আজকের মনের ভাব শাশুড়ী লক্ষ্য কর্‌ছিলেন, বললেন, খাবে না কেন শুনি?

বললুম, এখন ক্ষিদে নেই।

আমার মেজজা আমার চেয়ে বছর-চারেকের বড় ছিলেন। রান্না-ঘরের ভেতর থেকে ঠোকর দিয়ে ব'লে উঠলেন, বট্‌ঠাকুরের খাওয়া না হ'লে, বোধ হয় দিদির ক্ষিদে হবে না, না?

শাশুড়ী বললেন, তাই নাকি বৌমা? বলি, এ নতুন ঢঙ্‌ শিখলে কোথায়?

তিনি কিছুই মিথ্যে বলেননি, আমার পক্ষে এ ঢঙ্‌ই বটে, তবু খোঁটা সইতে পারলুম না, জবাব দিয়ে বসলুম, নূতন হবে কেন মা, তোমাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি খেতে?

তবু ভাল, ঘনশ্যামের এতদিনে কপাল ফিরল! ব'লে শাশুড়ী মুখখানা বিকৃত ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মেজজায়ের গলা কানে গেল। তিনি আমাকে শুনিয়েই বললেন, তখনই ত বলেছিলুম মা! বুড়ো শালিক পোষ মানবে না।

রাগ ক'রে ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু এইবার সমস্ত জিনিসটা মনে মনে আলোচনা ক'রে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগ্‌ল। কেবলই মনে হ'তে লাগল, তাঁর খাওয়া হয়নি ব'লে খাইনি তাঁর কথা নিয়ে ঝগড়া করেছি, ফিরে এসে, সব যদি তাঁর কানে যায়? ছি ছি! কি ভাব্‌বেন তিনি! আমার এতদিনের আচরণের সঙ্গে এ ব্যবহার এমনি বিসদৃশ,খাপছাড়া যে নিজের লজ্জাতেই নিজে ম'রে যেতে লাগলুম। কিন্তু বাঁচলুম, ফিরে এলে এ কথা কেউ তাঁকে শোনালে না।

সত্যিই বাঁচলুম, এর এক বিন্দু মিছে নয়, কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা যদি বলি, তোমরা বিশ্বাস করতে পার্‌বে কি? যদি বলি, সে রাত্রে পরিশ্রান্ত স্বামী শয্যার উপর ঘুমিয়ে রইলেন, আর নিচে যতক্ষণ না আমার ঘুম এল, ততক্ষণ ফিরে ফিরে কেবলই সাধ হ'তে লাগল, কেউ যদি কথাটা ওঁর কানে তুলে দিত, অভুক্ত স্বামীকে ফেলে আজ আমি কিছুতে খাইনি, এই নিয়ে ঝগড়া করেছি, তবু মুখ বুজে এ অন্যায় সহ্য করিনি, কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে কি? না হলে তোমাদের দোষ দেব না, হ'লে বহুভাগ্য ব'লে মান্‌ব। আজ আমার স্বামীর বড় ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই, তাঁর নাম নিয়ে বল্‌চি, মানুষের মন-পদার্থটার যে অন্ত নেই, সেই দিন তার আভাষ পেয়েছিলুম। এত বড় পাপিষ্ঠার

মনের মধ্যেও এমন দুটো উল্টো স্রোত একসঙ্গে ব'য়ে যাবার স্থান হ'তে পারে দেখে, তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলুম!

মনে মনে বলতে লাগলুম, এ যে বড় লজ্জার কথা! নইলে এখুনি ঘুম থেকে জাগিয়ে ব'লে দিতুম শুধু সৃষ্টিছাড়া ভালমানুষ হ'লেই হয় না, কর্ত্তব্য করতে শেখাও দরকার। যে স্ত্রীর তুমি একবিন্দু খবর নাও না, সে তোমার জন্যে কি করেচে একবার চোখ মেলে দেখ। হা রে পোড়া কপাল! খদ্যোৎ চায় সূর্য্যদেবকে আলো ধ'রে পথ দেখাতে। তাই বলি, হতভাগীর স্পর্দ্ধার কি আর আদি-অন্ত দাওনি ভগবান!

গরমের জন্যে কি না বলতে পারিনে, ক'দিন ধ'রে প্রায়ই মাথা ধরেছিল। দিন-পাঁচেক পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্ ক'রে কখন্ একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছিল, কে পাশে ব'সে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করচে। একবার ঠক্ ক'রে গায়ে পাখাটা ঠেকে যেতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে আলো জলছিল, চেয়ে দেখলুম স্বামী।

রাত জেগে ব'সে পাখার বাতাস ক'রে আমাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন!

হাত দিয়ে পাখাটা ধ'রে ফেলে বললুম, এ তুমি কি করচ?

তিনি বললেন, কথা কইতে হবে না, ঘুমোও, জেগে থাকলে মাথাধরা ছাড়বে না।

আমি বললুম, আমার মাথা ধ'রেছে, তোমাকে কে বললে?

তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, কেউ বলেনি; আমি হাত গুণতে জানি। কারো মাথা ধরলেই টের পাই।

বললুম, তা হ'লে অন্য দিনও পেয়েছ বল? মাথা ত শুধু আমার আজই ধরেনি।

তিনি আবার একটু হেসে বললেন, রোজই পেয়েছি। কিন্তু এখন একটু ঘুমোবে, না কথা কবে?

বললুম, মাথাধরা আমার ছেড়ে গেছে, আর ঘুমোবো না।

তিনি বললেন, তবে সবুর কর, ওষুধটা তোমার কপা‍ লাগিয়ে দিই, বলে উঠে গিয়ে কি একটা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে আমার কপালে ঘ'ষে দিতে লাগলেন। আমি ঠিক ইচ্ছে ক'রেই যে বললুম, তা নয়, কিন্তু আমার ডান হাতটা কেমন ক'রে তাঁর কোলের ওপর গিয়ে পড়তেই তিনি একটা হাত দিয়ে সেটা চেপে ধ'রে রাখলেন। হয়ত একবার একটু জোর ক'রেও ছিলুম। কিন্তু জোর আপনিই কোথায় মিলিয়ে গেল। দুরন্ত ছেলেকে মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর ক'রে ধ'রে রাখেন, তখন বাইরে থেকে হয়ত সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতও দেখায়, কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়তে বাধে না।

বাইরের লোক যাই বলুক, শিশু বোঝে, ওইটাই তার সব চেয়ে নিরাপদ স্থান। আমার এই জড়পিণ্ড হাতটারও বোধ করি সে জ্ঞানই ছিল, নইলে কি করে সে টের পেলে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে প'ড়ে থাকবার এমন আশ্রয় তার আর নাই।

তার পর তিনি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলতে লাগলেন, আমি চুপ ক'রে প'ড়ে রইলুম। আমি এর বেশি আর বলব না। আমার সেই প্রথম রাত্রির আনন্দ স্মৃতি—সে আমার, একেবারে আমারই থাক।

কিন্তু আমি ত জানতুম, ভালবাসার যা কিছু, সে আমি শিখে এবং শেষ ক'রে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী এসেচি। কিন্তু সে শেখা যে ডাঙায় হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার শেখার মত ভুল শেখা, এই সোজা কথাটা সেদিন যদি টের পেতাম। স্বামীর কোলের উপর থেকে আমার হাতখানা যে তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে শোষণ ক'রে এই কথাটাই আমার বুকের ভেতর পৌঁছে দেবার মত চেষ্টা করছিল, এই কথাটাই যদি সেদিন আমার কাছে ধরা পড়ত!

সকালে ঘুম ভেঙে দেখলুম, স্বামী ঘরে নেই, কখন্ উঠে গেছেন। হঠাৎ মনে হ'ল, স্বপন দেখিনি ত? কিন্তু চেয়ে দেখি, সেই ওষুধের শিশিটা তখনও শিয়রের কাছে রয়েছে। কি যেন মনে হ'ল, সেটা বার বার মাথায় ঠেকিয়ে তবে কুলুঙ্গিতে রেখে বাইরে এলুম।

শাশুড়ীঠাকরুণ সেই দিন থেকে আমার ওপর যে কড়া নজর রাখ্‌ছিলেন, সে আমি টের পেতুম। আমিও ভেবেছিলুম, মরুক্ গে, আমি কোন কথায় আর থাক্‌ব না। তা ছাড়া দুদিন আস্‌তে না আস্‌তে স্বামীর খাওয়া-পরা নিয়ে ঝগড়া—ছি ছি, লোকে শুন্‌লেই বা বল্‌বে কি?

কিন্তু কবে যে এর মধ্যেই আমার মনের ওপর দাগ প'ড়ে গিয়েছিল, কবে যে তাঁর খাওয়া-পরা নিয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম সে আমি নিজেই জান্‌তাম না। তাই দুটো দিন যেতে-না-যেতেই আবার একদিন ঝগড়া ক'রে ফেল্‌লুম।

আমার স্বামীর কে একজন আড়ৎদার বন্ধু সেদিন সকালে মস্ত একটা রুইমাছ পাঠিয়েছিলেন। স্নান কর্‌তে পুকুরে যাচ্ছি, দেখি বারান্দার ওপর সবাই জড় হয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। কাছে এসে দাঁড়ালুম, মাছ কোটা হয়ে গেছে। মেজজা তরকারী কুটচেন, শাশুড়ী ব'লে ব'লে দিচ্ছেন; এটা মাছের ঝোলের কুটনো, ওটা মাছের ডালনার কুটনো, ওটা মাছের অম্বলের কুটনো, এমনিই সমস্ত প্রায়, আঁস রান্না। আজ একাদশী, তাঁর এবং বিধবা মেয়ের খাবার হাঙ্গামা নেই, কিন্তু আমার স্বামীর জন্যে কোন ব্যবস্থাই দেখলুম না। তিনি বৈষ্ণবমানুষ, মাছ মাংস ছুঁতেন না। একটু ডাল, দুটো ভাজাভুজি, একটুখানি অম্বল হ'লেই তাঁর খাওয়া হ'ত। অথচ ভাল খেতেও তিনি ভালবাস্‌তেন। এক আধ দিন একটু ভাল তরকারি হ'লে তাঁর আহ্লাদের সীমা থাক্‌ত না, তাও দেখেচি।

বললুম, ওঁর জন্যে কি হচ্ছে মা ?

শাশুড়ী বললেন, আজ আর সময় কৈ বৌমা ? তার জন্যে দুটো আলু-উচ্ছে ভাতে দিতে ব'লে দিয়েছি, তার পর একটু দুধ দেব'খন।

বললুম, সময় নেই কেন মা ?

শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখতেই ত পাচ্ছ বৌমা ! এতগুলো মাস-রান্না হতেই ত দশটা এগারটা বেজে যাবে। আজ আমার অখিলের (মেজদেওর) দু-চার জন বন্ধু-বান্ধব খাবে, তারা হ'ল সব অপিসার মানুষ, দশটার মধ্যে খাওয়া না হ'লে পিত্তি প'ড়ে সারাদিন আর খাওয়াই হবে না। এর ওপর আবার নিরামিষ রান্না করতে গেলে ত রাঁধুনী বাঁচে না। তার প্রাণটাও ত দেখতে হবে বাছা !

রাগে সর্ব্বাঙ্গ রি রি ক'রে জলতে লাগল। তবু কোনমতে আত্মসংবরণ ক'রে বললুম, আলু-উচ্ছে-ভাতে দিয়ে কি কেউ খেতে পারে ? একটুখানি ডাল রাঁধবারও কি সময় হ'ত না ?

তিনি আমার মুখের পানে কটমট ক'রে চেয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারিনে বাছা, আমার কাজ আছে।

এতক্ষণ রাগ সামলেছিলুম, আর পারলুম না। বলে ফেললুম, কাজ সকলেরি আছে মা ! তিনি তিরিশ টাকার কেরাণী-গিরি করেন না ব'লে কুলি মানুষ ব'লে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পার। কিন্তু আমি ত পারিনে। আমি ওই দিয়ে তাঁকে খেতে দেব না। রাঁধুনি রাঁধতে না পারে, আমি যাচ্চি।

শাশুড়ী খানিকক্ষন অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি ত কাল এলে বৌমা, এতদিন তার কি ক'রে খাওয়া হ'ত শুনি ?

বললুম, সে খোঁজে আমার দরকার নেই। কিন্তু কাল এলেও আমি কচি খুকী নই মা। এখন থেকে সে সব হ'তে দিতে পারব না।

রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধুনীকে বল্লুম, বড়বাবুর জন্যে নিরামিষ ডাল-ডাল্‌না, অম্বল হবে। তুমি না পার, একটা উনুন ছেড়ে দাও, আমি এসে রাঁধচি, ব'লে আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না ক'রে স্নান কর্‌তে চ'লে গেলুম।

স্বামীর বিছানা আমি রোজ নিজের হাতেই করতুম। এই দপদপে সাদা বিছানাটির উপর ভেতরে ভেতরে যে একটা লোভ জন্মাচ্ছিল, হঠাৎ এত দিনের পর আজ বিছানা করবার সময় সে কথা জান্‌তে পেরে নিজের কাছেই যেন লজ্জায় ম'রে গেলুম।

ঘড়ীতে বারোটা বাজতে তিনি শুতে এলেন। কেন যে এত রাত পর্য্যন্ত জেগে ব'সে বই পড়ছিলুম, তাঁর পায়ের শব্দ সে খবর আজ এমনি স্পষ্ট করে আমার কানে কানে ব'লে দিলে যে, লজ্জায় মুখ তুলে চাইতেও পারলুম না।

স্বামী বল্‌লেন, এখনো শোওনি যে?

আমি বই থেকে মুখ তুলে ঘড়ীর পানে তাকিয়ে যেন চম্‌কে উঠলুম— তাই ত, বারোটা বেজে গেছে?

কিন্তু যিনি সব দেখ্‌তে পান, তিনি দেখেছিলেন, আমি পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়ী দেখেচি।

স্বামী শয্যায় ব'সে একটু হেসে বল্‌লেন, আজ আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছিলে?

বল্লুম, কে বল্‌লে?

তিনি বল্‌লেন, সেদিন তোমাকে ত বলেছি, আমি হাত গুণতে জানি।

বল্লুম, জান্‌লে ভালই! কিন্তু তোমার গোয়েন্দার নাম না বল, তিনি কি কি দোষ আমার দিলেন শুনি?

তিনি বল্‌লেন, গোয়েন্দা দোষ দেয়নি, কিন্তু আমি দিচ্ছি। আচ্ছা জিজ্ঞেসা করি, এত অল্পে তোমার রাগ হয় কেন?

বললুম, অল্প? তুমি কি ভাব, তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা দিয়েই সকলের ওজন চলবে? কিন্তু তাও বলচি, তুমি যে এত বলচ, এ অত্যাচার চোখে দেখলে তোমার রাগ হ'ত।

তিনি আবার একটু হাসলেন, বললেন, আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হ'তে বলেছেন, আর তোমাকে এখন থেকে তাই হ'তে হবে।

কেন, আমার অপরাধ?

বৈষ্ণবের স্ত্রী, এইমাত্র তোমার অপরাধ।

বললুম, তা হ'তে পারে, কিন্তু গাছের মত অন্যায় সহ্য করা আমার কাজ নয়, তা সে, যে প্রভুই আদেশ করুন। তা ছাড়া যে লোক ভগবান পর্য্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি?

স্বামী হঠাৎ যে চমকে উঠলেন, বললেন, কে ভগবান মানে না? তুমি?

বললুম, হাঁ, আমি।

তিনি বললেন, ভগবান মান না কেন?

বললুম, নেই বলে মানিনে। মিথ্যা ব'লে মানিনে।

আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলুম, আমার স্বামীর হাসি-মুখখানি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল, এই কথার পরে সে মুখ একেবারে যেন ছাইএর মত শাদা হয়ে গেল। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, শুনেছিলুম, তোমার মামা নাকি নিজেকে নাস্তিক বলতেন—

আমি মাঝখানেই ভুল শুধরে দিয়ে বললুম, তিনি নিজেকে নাস্তিক বলতেন না, Agnostic বলতেন—

স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে আবার কি?

আমি বললুম, Agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছেন বা নেই কোন কথাই বলে না।

কথাটা শেষ না হ'তেই স্বামী ব'লে উঠলেন, থাক্, এ সব আলোচনা। আমার সাম্‌নে তুমি কোন দিন আর এ কথা মুখে এনো না।

তবু তর্ক করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখপানে চেয়ে আর আমার মুখে কথা যোগাল না। ভগবানের ওপর তাঁর অচল বিশ্বাস আমি জান্‌তুম, কিন্তু কোন মানুষ যে আর একজনের মুখ থেকে তাঁর অস্বীকার শুন্‌লে এত ব্যথা পেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। এই নিয়ে মামার বস্‌বার ঘরে অনেক তর্ক নিজেও করেচি, অপরকেও করতে শুনেচি, রাগা-রাগি হয়ে যেতে বহুবার দেখেচি, কিন্তু এমন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যেতে কাউকে দেখিনি। আমি নিজেও ব্যথা বড় কম পেলুম না, কিন্তু কোন তর্ক না ক'রে এ ভাবে আমার মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়ায় অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কিন্তু ভাবি, আমার অপমানের পালাটা এর ওপর দিয়েই কেন সেদিন শেষ হ'ল না।

যে মাদুরটা পেতে আমি নিচে শুতুম, সেটা ঘরের কোণে গুটান থাক্‌ত; আজ কে সরিয়ে রেখেছিল, বল্‌তে পারিনে। খুঁজে পাচ্চিনে দেখে, তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোষক তুলে বল্‌লেন, আজ এইটে পেতে শোও। এত রাত্রে কোথা আর খুঁজে বেড়াবে বল।

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের লেশমাত্র ছিল না। তবুও কথাটা যেন অপমানের শূল হয়ে আমার বুকে বিঁধল। রোজ ত আমি নিচেই শুই। সামান্য একখানা মাদুর পেতে যেমন তেমন ভাবে রাত্রি যাপন করাটাই ত ছিল আমার সব চেয়ে বড় গর্ব্ব। কিন্তু স্বামীর ছোট্ট দুটি কথায় যে আজ আমার সেই গর্ব্ব ঠিক তত বড় লাঞ্ছনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেবে, এ কে ভেবেছিল?

অন্যত্র শোবার উপকরণ স্বামীর হাত থেকেই হাত পেতে নিলুম, কিন্তু শোবা মাত্রই কান্নার ঢেউ যেন আমার গলা পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠল।

জানিনে, তিনি শুন্‌তে পেয়েছিলেন কি না। সকাল হ'তে না হ'তেই তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা কর্‌চি, তিনি ডেকে বল্‌লেন, আজ এত ভোরে উঠলে যে?

বললুম, ঘুম ভেঙে গেল, তাই বাইরে যাচ্ছি।

বললেন, একটা কথা আমার শুন্‌বে?

রাগে, অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল, বললুম, তোমার কথা কি আমি শুনিনি?

আমার মুখপানে চেয়ে তিনি একটু হেসে বললেন, শোন, আচ্ছা তা হ'লে কাছে এস, বলি।

বললুম, আমি ত কালা নই, এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পাব।

পাবে না গো, পাবে না, বলেই হঠাৎ তিনি সুমুখে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতটা ধরে ফেললেন। আমি জোর করে ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারব কেন, একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে জোর করে আমার মুখ তুলে ধরে বললেন, যারা ভগবান মানে, তারা কি বলে জান? তারা বলে, স্বামীর কাছে কিছুতেই মিথ্যে বলতে নেই।

আমি বললুম, কিন্তু যারা ভগবান মানে না, তারা বলে, কারও কাছেই মিথ্যে বলতে নেই।

স্বামী হেসে বললেন, বটে! কিন্তু তাই যদি হয়, অতবড় মিথ্যে কথাটা কাল কি ক'রে মুখে আন্‌লে বল ত? কি ক'রে বললে ভগবান তুমি মান না?

হঠাৎ মনে হ'ল, এত আশা করে কেউ বুঝি কখনো কারও সঙ্গে কথা কয়নি। তাই বলতে মুখে বাধতে লাগল, কিন্তু তবু ত পোড়া অহঙ্কার গেল না, বলে ফেললুম, ভগবান মানি বললেই বুঝি সত্য কথা বলা হ'ত? আমাকে আটকে রাখলে কেন? আর কোন কথা আছে?

তিনি ম্লানমুখে আস্তে আস্তে বললেন, আর একটা কথা, মায়ের কাছে আজ মাপ চেয়ো।

আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠলো; বললুম, মাপ চাওয়াটা কি ছেলেখেলা, না তার কোন অর্থ আছে?

স্বামী বললেন, অর্থ তার এই যে, সেটা তোমার কর্ত্তব্য।

বললুম, তোমাদের ভগবান্ বুঝি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিয়ে অপরাধীর নিকট ক্ষমা চেয়ে কর্ত্তব্য করুক্?

স্বামী আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, ভগবানের নাম নিয়ে তামাসা করতে নেই, এ কথা ভবিষ্যতে কোন দিন আর যেন মনে করে দিতে আমায় না হয়। আমি তর্ক করতে ভালবাসিনে—মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পার, তাঁর সঙ্গে আর কখনও বিবাদ করতে যেও না।

বললুম, কেন, শুন্‌তে পাইনে?

তিনি বললেন, না। নিষেধ করা আমার কর্ত্তব্য, তাই নিষেধ করে দিলুম। এই বলে তিনি বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। আমি আর সইতে পারলুম না, বললুম, কর্ত্তব্যজ্ঞানটা তোমাদের যদি এত বেশি, সে কি আর কারও নেই? আমিও ত মানুষ, বাড়ীর মধ্যে আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। থাকলেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হ'লে গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্ত্তব্য? সে যদি হয়, যে দিন ইচ্ছে বাপের বাড়ী যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

স্বামী চ'লে গেলেন, আমি সেইখানেই ধপ ক'রে ব'সে পড়লুম।

মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হ'ল, হায় রে! যার জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর!

সমস্ত সকালটা যে আমার কি করে কাটল, সে আমিই জানি। কিন্তু দুপুর-বেলা স্বামীর মুখ থেকেই যে কথা শুনলুম তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

খেতে বসিয়ে শাশুড়ী বল্‌লেন, কাল তোমাকে বলিনি বাছা, কিন্তু এ বৌ নিয়ে ত আমি ঘর ক'র্‌তে পারিনে ঘনশ্যাম! কাল্‌কের কাণ্ড ত শুনেচ?

স্বামী বল্‌লেন, শুনেচি মা!

শাশুড়ী বল্‌লেন, তা হ'লে যা হোক্‌, এর একটা ব্যবস্থা কর।

স্বামী একটুখানি হেসে বল্‌লেন, ব্যবস্থা কর্‌বার মালিক ত তুমি নিজেই মা।

শাশুড়ী বল্‌লেন, তা কি তার পারিনে বাছা, একদিনেই পারি। এত বড় ধাড়ী মেয়ে, আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছা ছিল না—শুধু—

স্বামী বল্‌লেন, সে কথা ভেবে আর লাভ কি মা! আর ভালমন্দ যাই হোক্‌ বাড়ীর বড়বৌকে ত আর ফেলতে পার্‌বে না! ও চায়, আমি একটু ভাল খাই দাই। ভাল, সে ব্যবস্থাই কেন করে দাও না মা!

শাশুড়ী বল্‌লেন, অবাক্‌ কর্‌লি ঘনশ্যাম। আমি কি ভালমন্দ খেতে দিতে জানিনে যে আজ ও এসে আমাকে শিখিয়ে দেবে? আর তোমারই বা দোষ কি বাবা! অত বড় বৌ যেদিন এসেচে, সেই দিনই জানতে পেরেচি, সংসার এবার ভাঙল। তা বাছা, আমার গিন্নিপনায় আর না যদি চলে, ওর হাতেই না হয় ভাঁড়ারের চাবি দিচ্চি। কৈ গো, বড়বৌমা, বেরিয়ে এস গো, চাবি নিয়ে যাও! ব'লে শাশুড়ী ঝনাৎ করে চাবির গোছাটা রান্নাঘরের দাওয়ার উপর ফেলে দিলেন।

স্বামী আর একটি কথাও কইলেন না; মুখ বুজে ভাত খেয়ে বাইরে

যাবার সময় বল্‌তে বল্‌তে গেলেন, সব মেয়েমানুষের ঐ এক রোগ, কাকেই বা কি বলি!

আমার বুকের মধ্যে যেন আহ্লাদের জোয়ার ডেকে উঠল। আমি যে কেন ঝগড়া করেচি, তা উনি জানতে পেরেছেন, এই কথাটা শতবার মুখে আবৃত্তি করে সহস্র রকমে মনের মধ্যে অনুভব কর্‌তে লাগলুম। সকালের সমস্ত ব্যথা আমার যেন ধুয়ে মুছে গেল।

এখন কতবার মনে হয়, ছেলে-বেলা থেকে কাজের অকাজের কত বই প'ড়ে কত কথাই শিখেছিলুম, কিন্তু এ কথাটা কোথাও যদি শিখতে পেতুম, পৃথিবীতে তুচ্ছ একটি কথা গুছিয়ে না বল্‌বার দোষে, ছোট একটি কথা মুখ ফুটে না বল্‌বার অপরাধে, কত শত ঘর-সংসারই না ছারখার হয়ে যায়। হয়ত, তা হ'লে এ কাহিনী লেখবার আবশ্যকই হ'ত না।

তাইত বার বার বলি, ওরে হতভাগী! এত শিখেছিলি, এটা শুধু শিখিসনে, মেয়েমানুষের কার মানে মান! কার হতাদরে তোদের মানের অট্টালিকা তাসের অট্টালিকার মতই এক নিমিষে একটা ফুঁয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়!

তবে তোর কপাল পুড়্‌বে না ত পুড়্‌বে কার? সমস্ত সন্ধ্যা-বেলাটা ঘরে খিল দিয়ে যদি সাজ-সজ্জাই কর্‌লি, অসময়ে ঘুমের ভাণ করে যদি স্বামীর পালঙ্কের একধারে গিয়ে শুতেই পার্‌লি, তাঁকে একটা সাড়া দিতেই কি তোর কণ্ঠরোধ হ'ল। তিনি ঘরে ঢুকে দ্বিধায়, সঙ্কোচে বার বার ইতস্ততঃ করে যখন বেরিয়ে গেলেন, একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধরে ফেলতেই কি তোর হাতে পক্ষাঘাত হ'ল? সেই ত সারারাত্রি ধরে মাটিতে পড়ে পড়ে কাঁদ্‌লি, একবার মুখ ফুটে বল্‌তেই কি শুধু এত বাধা হ'ল যে, আচ্ছা, তুমি তোমার বিছানাতে এসে শোও, আমি আমার ভূমি-শয্যায় না হয় ফিরে যাচ্ছি।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, মনে হ'ল যেন জ্বর হয়েচে। উঠে বাইরে যাচ্চি, স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি মুখ নিচু ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি বল্‌লেন, তোমাদের গ্রামের নরেনবাবু এসেছেন।

বুকের ভেতরটায় ধ্বক্ ক'রে উঠ্‌ল।

স্বামী বল্‌তে লাগলেন, আমাদের নিখিলের তিনি কলেজের বন্ধু। চিতোর বিলে হাঁস শিকার কর্‌বার জন্য কল্‌কাতায় থাকতে সে বুঝি কবে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছিল, তাই এসেছেন। তুমিও তাঁকে বেশ চেন, না?

উঃ, মানুষের স্পর্দ্ধার কি একটা সীমা থাক্‌তে নেই।

ঘাড় নেড়ে জানালুম, আছে। কিন্তু ঘৃণায় লজ্জায় নখ থেকে চুল পর্য্যন্ত আমার তেতো হ'য়ে গেল।

স্বামী বল্‌লেন, তোমার প্রতিবেশীর আদর যত্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে।

শুনে এম্‌নি চম্‌কে উঠ্‌লুম যে, ভয় হ'ল, হয়ত আমার চমকটা তাঁর চোখে পড়েচে। কিন্তু এদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বল্‌লেন, কাল রাত্রি থেকেই মায়ের বাতটা ভয়ানক বেড়েচে। এদিকে নিখিলও বাড়ী নেই, অখিলকেও তার আফিস করতে হবে।

মুখ নিচু ক'রে কোন মতে বল্‌লুম, তুমি?

আমার কিছুতেই থাক্‌বার যো নেই। রায়গঞ্জে পাট কিনতে না গেলেই নয়।

কখন ফিরবে?

ফিরতে আবার কাল এই সময়। রাত্রিটা সেইখানেই থাকতে হবে।

তা হ'লে আর কোথাও তাঁকে যেতে বল। আমি বৌমানুষ, শ্বশুর-বাড়ীতে তাঁর সামনে বার হতে পার্‌ব না।

স্বামী বল্‌লেন, ছি, তা কি হয়। আমি সমস্ত ঠিক করে দিয়ে যাচ্চি,

তুমি সামনে না বার হও, আড়াল থেকে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ো। এই ব'লে তিনি বাইরে চ'লে গেলেন।

সেই দিন পাঁচ মাস পরে আবার নরেনকে দেখলুম। দুপুর-বেলা সে খেতে ব'সেছিল, আমি রান্নাঘরের দোরের আড়ালে ব'সে কিছুতেই চোখের কৌতূহল থামাতে পারলুম না। কিন্তু চাইবামাত্রই আমার সমস্ত মনটা এমন একপ্রকার বিতৃষ্ণায় ভ'রে গেল যে, সে পরকে বোঝান শক্ত। মস্ত একটা তেঁতুলবিছে এঁকে-বেঁকে চ'লে যেতে দেখলে সর্ব্বাঙ্গ যেমন ক'রে ওঠে, অথচ যতক্ষণ সেটা দেখা যায়, চোখ ফিরুতে পারা যায় না, ঠিক তেমনি ক'রে আমি নরেনের পানে চেয়ে রইলুম। ছি, ছি, ওর ওই দেহটাকে কি ক'রে যে একদিন ছুঁয়েছি, মনে পড়তেই সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়ে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠ্‌ল।

খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে চারিদিকে কি যে খুঁজছিল, সে আমি জানি। আমাদের রাঁধুনী কি একটা তরকারি দিতে গেল, সে হঠাৎ ভারি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ গা, তোমাদের বড়বৌ যে বড় বেরুলো না?

রাঁধুনী জান্‌ত যে, ইনি আমাদের বাপের বাড়ীর লোক—গ্রামের জমীদার। তাই বোধ করি খুসী করবার জন্যেই হাসির ভঙ্গিতে একঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে তার মন যোগালে। বললে, কি জানি বাবু, বড়বৌমার ভারি লজ্জা, নইলে তিনিই ত আপনার জন্যে আজ নিজে রাঁধলেন। রান্নাঘরে ব'সে তিনিই ত আপনার সব খাবার এগিয়ে গুছিয়ে দিচ্চেন। লজ্জা ক'রে কিন্তু কম সম খাবেন না, বাবু, তা হ'লে তিনি বড় রাগ করবেন, আমাকে ব'লে দিলেন।

মানুষের শয়তানীর অন্ত নেই, দুঃসাহসেরও অবধি নেই। সে স্বচ্ছন্দে স্নেহের হাসিতে মুখখানা রান্নাঘরের দিকে তুলে চেঁচিয়ে বললে, আমার

কাছে তোর আবার লজ্জা কি রে সদু? আয় আয়, বেরিয়ে আয়। অনেক দিন দেখিনি, একবার দেখি।

কাঠ হয়ে সেই দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মেজজাও রান্নাঘরে ছিল, ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে, দিদির সবটাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার লোক, ভাইয়ের মত, বিয়ের দিন পর্য্যন্ত সামনে বেরিয়েচ, কথা কয়েচ, আর আজই যত লজ্জা। একবার দেখ্‌তে চাচ্চেন, যাও না।

এর আর জবাব দেব কি?

বেলা তখন দুটো আড়াইটে, বাড়ীর সবাই যে যার ঘরে শুয়েচে, চাকরটা এসে বাইরে থেকে বল্‌লে, বাবু পান চাইলেন মা।

কে বাবু?

নরেনবাবু।

তিনি শিকার কর্‌তে যান্‌নি?

কই না, বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন যে।

তা হ'লে শিকারের ছলটাও মিথ্যে।

পান পাঠিয়ে দিয়ে জানালায় এসে বসলুম। বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত এই জানালাটিই ছিল সব চেয়ে আমার প্রিয়। নিচেই ফুল-বাগান, এক ঝাড় চামেলী ফুলের গাছ দিয়ে সম্মুখটা ঢাকা, এখানে বস্‌লে বাইরের সমস্ত দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

আমি মানুষের মনের এই বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখি যে, যে বিপদটা হঠাৎ তার ঘাড়ে এসে প'ড়ে তাকে একান্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন ক'রে দিয়ে যায়, অনেক সময়ে সে তাকেই একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা তুচ্ছ কথা চিন্তা করতে ব'সে যায়। বাইরে পান পাঠিয়ে দিয়ে আমি নরেনের কথাই ভাবতে বসেছিলুম সত্যি, কিন্তু কখন কোন্ ফাঁকে যে আমার স্বামী এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে ব'সে গিয়েছিলেন, সে আমি টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আমি যত দেখ্‌ছিলুম, ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলুম। সব চেয়ে আশ্চর্য্য হতুম—তাঁর ক্ষমা কর্‌বার ক্ষমতা দেখে। আগে আগে মনে হ'ত এ তাঁর দুর্ব্বলতা, পুরুষত্বের অভাব। শাসন কর্‌বার সাধ্য নেই ব'লেই ক্ষমা করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিলুম যেমন বুদ্ধিমান তেমনি দৃঢ়। আমাকে যে তিনি ভেতরে ভেতরে কত ভালবেসেছেন, সে ত আমি অসংশয়ে অনুভব করতে পারি কিন্তু সে ভালবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার ত হয় না।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলুম, আচ্ছা, তুমিই বাড়ীর সর্ব্বস্ব, কিন্তু তোমাকে যে বাড়ীশুদ্ধ সবাই অযত্ন অবহেলা করে, এমন কি অত্যাচার করে, এ কি তুমি ইচ্ছা কর্‌লে শাসন ক'রে দিতে পার না?

তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, কৈ কেউ ত অযত্ন করে না।

কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতুম, কিছুই তাঁর অবিদিত ছিল না।

বললুম, আচ্ছা যত বড় দোষই হোক, তুমি কি সব মাপ করতে পার?

তিনি তেমনি হাসিমুখে বল্‌লেন, যে সত্যি ক্ষমা চায়, তাকে কর্‌তেই হবে, এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো!

তাই এক-একদিন চুপ ক'রে বসে ভাব্‌তুম, ভগবান যদি সত্যি নেই, তা হ'লে এত শক্তি, এত শান্তি ইনি পেলেন কোথায়? এই যে আমি স্ত্রীর কর্ত্তব্য একদিনের জন্যে করিনে, তবু ত তিনি কোন দিন স্বামীর জোর নিয়ে আমার অমর্য্যাদা অপমান করেন না?

আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি শ্বেত-পাথরের গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ছিল, আমি কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি, স্বামী বিছানার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে আছেন, আর দুচক্ষু দিয়ে অশ্রুর ধারা ব'য়ে যাচ্ছে। সময়ে সময়ে তাঁর মুখ দেখে আমারও যেন কান্না আস্‌ত, মনে হ'ত, অমনি ক'রে একটা দিনও কাঁদতে পার্‌লে বুঝি মনের অর্দ্ধেক বেদনা

কমে যাবে। পাশের কুলুঙ্গিতে তাঁর খান-কয়েক বড় আদরের বই ছিল, তাঁর দেখাদেখি আমিও মাঝে মাঝে পড়্‌তুম। লেখাগুলো যে আমি সত্যি বলে বিশ্বাস করতুম, তা নয়, তবুও এমন কতদিন হয়েছে, কখন্‌ পড়ায় মন লেগে গেছে, কখন্‌ বেলা বয়ে গেছে, কখন্‌ দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গালের উপর শুকিয়ে আছে, কিছুই ঠাওর পাইনি! কত দিন হিংসে পর্য্যন্ত হয়েছে, তাঁর মত আমিও যদি এগুলি সমস্ত সত্যি ব'লেই ভাবতে পারতুম।

কিছুদিন থেকে আমি বেশ টের পেতুম, কি একটা ব্যথা যেন প্রতিদিনই আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠছিল। কিন্তু কেন কিসের জন্যে, তা কিছুতে হাতড়ে পেতুম না। শুধু মনে হ'ত আমার যেন কেউ কোথাও নেই। ভাবতুম, মায়ের জন্যেই বুঝি ভেতরে ভেতরে মন কেমন করে, তাই কত দিন ঠিক করেচি, কালই পাঠিয়ে দিতে বল্‌ব, কিন্তু যেই মনে হ'ত, এই ঘরটি ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি না, অমনি সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় যে ভেসে যেত, তাকে মুখ ফুটে বলাও হ'ত না।

মনে করলুম, যাই, কুলুঙ্গি থেকে বইখানা এনে একটু পড়ি। আজ-কাল এই বইখানা হয়েছিল আমার অনেক দুঃখের সান্ত্বনা। কিন্তু উঠ্‌তে গিয়ে হঠাৎ আঁচলে একটা টান পড়তেই ফিরে চেয়ে নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস হ'ল না। দেখি, আমার আঁচল ধরে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন। একটু হলেই চেঁচিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! সে কখন এসেচে, কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই জান্‌তে পারিনি। কিন্তু কি ক'রে যে সেদিন আপনাকে সাম্‌লে ফেলেছিলুম, আমি আজও ভেবে পাইনে। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে এসেচ কেন? শিকার করতে?

নরেন বল্‌লে, ব'স বলচি।

আমি জানালার ওপর ব'সে পড়ে বল্‌লুম, শিকার করতে যাওনি কেন?

নরেন বল্‌লে, ঘনশ্যামবাবুর হুকুম পাইনি। যাবার সময় ব'লে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ী থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।

চক্ষের নিমেষে স্বামী-গর্ব্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠ্‌ল। তিনি কোন কর্ত্তব্য ভোলেন না, সেদিকে তাঁর একবিন্দু দুর্ব্বলতা নেই। মনে মনে ভাবলুম, এ লোকটা দেখে যাক, আমার স্বামী কত বড।

বল্‌লুম, তা হ'লে বাড়ী ফিরে গেলে না কেন?

সে লোকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে খপ্‌ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বল্‌লে, সদু, টাইফয়েড্‌ জ্বরে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে উঠে যখন শুন্‌লুম তুমি পরের হয়েচ, আর আমার নেই, তখন বারবার করে বল্‌লুম, ভগবান, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি এইটুকু বয়সের মধ্যে এমন কি পাপ করেচি, যার শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লে!

বললুম, তুমি ভগবান মান?

নরেন থতমত খেয়ে বলতে লাগ্‌ল, না হ্যাঁ না, মানিনে, কিন্তু সে সময়ে—কি জান।

থাক্‌গে, তার পরে?

নরেন ব'লে উঠল, উঃ, সে আমার কি দিন, যে দিন, শুনলুম, তুমি আমারই আছ, শুধু নামেই অন্যের, নইলে, আমারই চিরকাল, শুধু আমারই। আজও একদিনের জন্য আর কারও শয্যায় রাত্রি—

ছি, ছি, চুপ কর। কিন্তু কে তোমাকে এ খবর দিলে? কার কাছে শুন্‌লে।

তোমাদের যে দাসী তিন-চার দিন হ'ল বাড়ী যাবার নাম ক'রে চলে গেছে, যে—

মুক্ত কি তোমার লোক ছিল? ব'লে জোর ক'রে তার হাত ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু এবারেও সে তেম্‌নি সজোরে ধ'রে রাখ্‌লো। তার

চোখ দিয়ে ফোঁটা-দুই জলও গড়িয়ে পড়ল। বললে, সদু, এমনি ক'রেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে? অমন অসুখে না পড়লে আজ কেউ ত আমাদের আলাদা ক'রে রাখতে পারত না! যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্য এত বড় শাস্তি ভোগ করব? লোক ভগবান, ভগবান করে, কিন্তু তিনি সত্যি থাক্‌লে কি বিনা দোষে এতবড় সাজা আমাদের দিতেন? কখন না। তুমিই বা কিসের জন্য একজন অজানা-অচেনা মুখ্যুলোকের—

থাক্, থাক্, ও কথা থাক্।

নরেন চম্‌কে উঠে বল্‌লে, আচ্ছা, থাক্, কিন্তু যদি জান্‌তুম, তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েচ, তা হ'লে হয়ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পার্‌তুম, কিন্তু কোন সম্বলই যে আমার হাতে নেই, আমি বাঁচব কি ক'রে?

আবার তার চোখে জল এসে পড়ল। এবার সে আমার হাতটাই টেনে নিয়ে তার নিজের চোখের জল মুছে বল্‌লে, এমন কোন সভ্যদেশ পৃথিবীতে আছে—যেখানে এত বড় অন্যায় হ'তে পারত! মেয়েমানুষ হ'লে কি তার প্রাণ নেই, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন করে তাকে সারাজীবন দগ্ধ করবার অধিকার সংসারে কার আছে? কোন দেশের মেয়েরা ইচ্ছে কর্‌লে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে যেখানে খুসি চ'লে যেতে না পারে?

এ সব কথা আমি সমস্তই জান্‌তুম। আমার মামার ঘরে নব্য-যুগের সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার কোন আলোচনাই বাকি ছিল না। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুলতে লাগ্‌ল! বল্‌লুম, তুমি আমাকে কি কর্‌তে বল?

নরেন বললে, আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাব যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্য্যন্ত আমি এই

আজকের দিনের প্রতীক্ষা ক'রেই পথ চেয়েছিলুম। তার পরে হয়ত একদিন শুনতে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেচি, তার কাছেই ফিরে চ'লে গেছি। কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল সদু, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের দু'ফোঁটা জল পাই। আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে।

আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই রইল, চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। এখন ভাবি, সেদিন যদি ঘূণাগ্রেও জানতুম, মানুষের মনের দাম এই, একেবারে উল্টো ধারায় বইয়ে দিতে এইটুকু মাত্র সময়, এইটুকু মাত্র মাল মসলার প্রয়োজন, তা হ'লে যেমন ক'রে হোক, সেদিন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জানালা বন্ধ ক'রে দিতুম, কিছুতেই তার একটা কথাও কানে ঢুকতে দিতুম না। কটা কথা, ক'ফোঁটা চোখের জলই বা তার খরচ হয়েছিল। কিন্তু নদীর প্রচণ্ড স্রোতে পাতাশুদ্ধ শর গাছ যেমন ক'রে কাঁপতে থাকে, তেমনি ক'রে আমার সমগ্র দেহটা কাঁপতে লাগ্‌ল, মনে হ'তে লাগ্‌ল, নরেন যেন কোন অদ্ভুত কৌশলে আমার পাঁচ আঙুলের ভেতর দিয়ে, পাঁচ শ বিদ্যুতের ধারা আমার সর্ব্বাঙ্গে বইয়ে দিয়ে আমার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত অবশ ক'রে আন্‌চে। সেদিন মাঝখানের সেই লোহার গরাদগুলো যদি না থাকৃত, আর সে যদি আমাকে টেনে তুলে নিয়ে পালাত, হয়ত আমি একবার চেঁচাতে পর্য্যন্ত পারতুম না—ওগো, কে আছ আমায় রক্ষা কর! দুজনে কতক্ষণ এমন স্তব্ধ হয়ে ছিলুম জানিনে, সে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, সদু!

কেন?

তুমি ত বেশ জান, আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়েমানুষকে বেঁধে রাখবার শেকল মাত্র! যেমন ক'রে হোক্ আটকে রেখে তাদের সেবা নেবার ফন্দি। সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলায়, পুরুষের

বেলায় সব ফাঁকি! আত্মা আত্মা যে করে, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্যে?

বৌমা, বলি কথা তোমাদের শেষ হবে না বাছা?

মাথার ওপর বাজ ভেঙে পড়লেও বোধ করি, মানুষে এমন ক'রে চম্‌কে ওঠে না, আমরা দুজনে যেমন করে চম্‌কে উঠলুম। নরেন হাত ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড়্‌ল, আমি মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লুম, বারান্দায় খোলা জানালার ঠিক সুমুখে দাঁড়িয়ে আমার শাশুড়ী।

বললেন, বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সভ্য-ভব্য নয়, অমন ক'রে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান্না-কাটি করতে দেখ্‌লে হয়ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত দেখ্‌তে শুন্‌তে সব দিকে বেশ হ'ত।

কি একটা জবাব দিতে গেলুম, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভটা আমার আড়ষ্ট রইল, একটা কথাও ফুটল না।

তিনি একটুখানি হেসে বললেন, বলতে পারিনে বাছা, শুধু ভেবেই মরি, বৌমাটি কেন আমার এত কষ্ট স'য়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন! তা বেশ! বাবুটি নাকি দুপুর-বেলায় চা খান। চা তৈরীও হয়েছে, একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর দেখি বৌমা, চায়ের পিয়ালাটা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব, না ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে খাবেন?

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টায় তবে কথা কইতে পারলুম, বললুম, তুমি কি রোজ এম্‌নি ক'রে আমার ঘরে আড়ি পাত মা?

শাশুড়ী মাথা নেড়ে বললেন, না না, সময় পাই কোথা? সংসারের কাজ ক'রেই ত সারতে পারিনে। এই দেখ না বাছা, বাতে মরুচি তবু চা তৈরী করতে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছিল। তা এ ঘরেই না হয় পাঠিয়ে

দিচ্চি, বাবুটির আবার ভারি লজ্জার শরীর, আমি থাক্‌তে হয়ত খাবেন না। তা যাচ্ছি আমি—, ব'লে তিনি ফিক্ ক'রে একটু মুচকে হেসে চ'লে গেলেন। এম্‌নি মেয়েমানুষের বিদ্বেষ! প্রতিশোধ নেবার বেলায় শাশুড়ী-বধূর মান্য সম্বন্ধের কোন উঁচু-নিচুর ব্যবধানই রাখলেন না।

সেইখানেই মেঝের ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম, সর্ব্বাঙ্গ ব'য়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে ঘাম ঝরে সমস্ত মাটিটা ভিজে গেল।

শুধু একটা সান্ত্বনা ছিল, আজ তিনি আস্‌বেন না, আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ চুপ করে পড়ে থাক্‌তে পাব, তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

কতবার ভাবলুম উঠে বসি, কাজ কর্ম্ম করি—যেন কিছুই হয়নি কিন্তু কিছুতেই পারলুম না, সমস্ত শরীর যেন থর্ থর্ করতে লাগল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এ ঘরে কেউ আলো দিতে এল না।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা, সহসা তাঁর গলা বাইরে থেকে কানে আস্‌তেই বুকের সমস্ত রক্ত চলা-চল যেন একেবারে থেমে গেল! তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, বঙ্কু, নরেনবাবু হঠাৎ চলে গেলেন কেন রে! চাকরের জবাব শোনা গেল না। তখন নিজেই বললেন, খুব সম্ভব শিকার করতে বারণ করেছিলুম ব'লে। তা উপায় কি! অন্দরে ঢুক্‌তেই, শাশুড়ীঠাকরুণ ডেকে বল্‌লেন, একবার আমার ঘরে এস ত বাবা!

তাঁর যে এক মুহূর্ত্ত দেরি সইবে না, সে আমি জান্‌তুম। তিনি যখন আমার ঘরে এলেন, আমি কিসের একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর আঘাত প্রতীক্ষা করেই যেন সর্ব্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত করে পড়ে রইলুম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বল্‌লেন না। কাপড়-চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বেরিয়ে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি, শাশুড়ী তাকে যেন এইমাত্র একটা কথাও বলেননি। তার পরে যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে তিনি ঘরে শুতে এলেন।

সারা-রাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও হ'ল না। সকাল-বেলা সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছি মেজজা বল্‌লেন, হেঁসেলে তোমার আর এসে কাজ নেই দিদি, আজ আমিই আছি। বল্‌লুম, তুমি থাকলে কি আমাকে থাকতে নেই মেজদি?

কাজ কি, মা কি জন্যে বারণ ক'রে গেলেন, ব'লে তিনি যে ঘাড় ফিরিয়ে টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, সে আমি স্পষ্ট টের পেলুম। মুখ দিয়ে আমার একটা কথাও বার হ'ল না, আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এলুম।

দেখলুম, বাড়ীশুদ্ধ সকলের মুখ ঘোর অন্ধকার, শুধু যাঁর মুখ সব চেয়ে অন্ধকার হবার কথা, তাঁর মুখেই কোন বিকার নেই। স্বামীর নিত্য প্রসন্ন মুখ, আজও তেমনি প্রসন্ন!

হায় রে, শুধু একবার গিয়ে যদি বলি, প্রভু, এই পাপিষ্ঠার মুখ থেকে তার অপরাধের বিবরণ শুনে তাকে নিজের হাতে দণ্ড দাও, কিন্তু সমস্ত লোকের এই বিচারহীন শাস্তি আর সহ্য হয় না! কিন্তু সে ত কোন মতেই পারলুম না। তবুও এই বাড়ীতে এই ঘরের মধ্যেই আমার দিন কাটতে লাগল।

এ কেমন ক'রে আমার দ্বারা সম্ভব হ'তে পেরেছিল, তা আজ আমি জানি! যে কাল মায়ের বুক থেকে পুত্রশোকের ভার পর্য্যন্ত হাল্‌কা ক'রে দেয়, সে যে এই পাপিষ্ঠার মাথা থেকে তার অপরাধের বোঝা লঘু ক'রে দেবে, সে আর বিচিত্র কি? যে দণ্ড একদিন মানুষ অকাতরে মাথায় তুলে নেয়, তার একদিন তাকেই সে মাথা থেকে ফেলতে পারলে বাঁচে! কালের ব্যবধানে অপরাধের খোঁচা যত অস্পষ্ট, যত লঘু হয়ে আসতে থাকে, দণ্ডের ভার ততই গুরুতর, ততই অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে! এই ত মানুষের মন! এই ত তার গঠন! তাকে অনিশ্চিত

সংশয়ে মরিয়া ক'রে তোলে। একদিন, দুদিন ক'রে যখন সাতদিন কেটে গেল, তখন কেবলই মনে হ'তে লাগল, এতই কি দোষ ক'রেচি যে স্বামী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা না ক'রে নির্ব্বিচারে দণ্ড দিয়ে যাবেন! কিন্তু তিনি যে সকলের সঙ্গে মিলে নিঃশব্দে আমাকে পীড়ন করে যাচ্ছেন, এ বুদ্ধি যে কোথায় পেয়েছিলুম, এখন তাই শুধু ভাবি।

সেদিন সকালে শুন্‌লুম শাশুড়ী বল্‌চেন, ফিরে এলি মা মুক্ত! পাঁচ দিন ব'লে কত দিন দেরি করলি বল ত বাছা?

সে যে কেন ফিরে এসেচে, তা মনে মনে বুঝ্‌লুম।

নাইতে যাচ্চি, দেখা হ'ল। মুচ্‌কে হেসে হাতের মধ্যে একটা কাগজ গুঁজে দিলে। হঠাৎ মনে হ'ল, সে যেন এক টুকরো জলন্ত কয়লা আমার হাতের তেলোয় টিপে ধরেচে। ইচ্ছে হ'ল তখ্‌খুনি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু সে যে নরেনের চিঠি! না প'ড়েই যদি ছিঁড়ে ফেলতে পারব, তা হ'লে মেয়েমানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের সেই অফুরন্ত চিরন্তন কৌতূহল জমা হয়ে র'য়েচে কিসের জন্যে? নির্জ্জন পুকুরঘাটে জলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঠি খুলে বস্‌লুম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও পড়্‌তে পার্‌লুম না। চিঠি লাল কালিতে লেখা। মনে হ'তে লাগল, তার রাঙা অক্ষরগুলো যেন একপাল কেন্নোর বাচ্চার মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে কিল কিল ক'রে ন'ড়ে ন'ড়ে বেড়াচ্চে। তার পরে পড়্‌লুম—একবার, দুবার, তিনবার পড়্‌লুম। তার পরে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে স্নান ক'রে ঘরে ফিরে এলুম। কি ছিল তাতে? সংসারে যা সব চেয়ে বড় অপরাধ, তাই লেখা ছিল।

ধোপা এসে বললে, মাঠাকরুণ, বাবুর ময়লা কাপড় দাও।

আমার পকেটগুলো সব দেখে দিতে গিয়ে একখানা পোষ্টকার্ড বেরিয়ে

এল, হাত তুলে দেখি, আমার চিঠি, মা লিখেচেন। তারিখ দেখলুম, পাঁচ দিন আগের, কিন্তু আজও আমি পাইনি।

প'ড়ে দেখি সর্ব্বনাশ! মা লিখেচেন, শুধু রান্নাঘরটি ছাড়া আর সমস্ত পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এই ঘরটির মধ্যে কোনমতে সবাই মাথা গুঁজে আছেন।

দুচোখ জ্বালা কর্‌তে লাগল, কিন্তু এক ফোঁটা জল বেরুল না। কত-ক্ষণ যে এ ভাবে ব'সেছিলুম, জানিনে, ধোপার চীৎকারে আবার সজাগ হ'য়ে উঠ্‌লুম। তাড়াতাড়ি তাকে কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে, বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। এইবার চোখের জলে বালিস ভিজে গেল। কিন্তু এই কি তাঁর ঈশ্বরপরায়ণতা! আমার মা গরীব, একবিন্দু সাহায্য কর্‌তে অনুরোধ করি, এই ভয়ে চিঠিখানা পর্য্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়নি। এত বড় ক্ষুদ্রতা আমার নাস্তিক মামার দ্বারা কি কখনো সম্ভব হতে পার্‌ত!

আজ তিনি ঘরে আস্‌তে কথা কইলুম। বললুম, আমাদের বাড়ী পুড়ে গেছে?

তিনি মুখপানে চেয়ে বললেন, কোথায় শুন্‌লে।

গায়ের ওপর পোষ্টকার্ডখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জবাব দিলুম, ধোপাকে কাপড় দিতে তোমারই পকেট থেকে পেলুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক ব'লে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু যারা লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি ক'রে বেড়ায়, তাদের আমরাও ঘৃণা করি। তোমার বাড়ীশুদ্ধ লোকেরই কি এই ব্যবসা?

যে লোক নিজের অপরাধে মগ্ন হয়ে আছে, তার মুখের এই কথা! কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এত বড় স্পর্দ্ধিত আঘাত আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ সহ্য কর্‌তে পার্‌ত না। মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয় কবচের মতই যে তাঁর মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষে কর্‌ত, আমার এমন তীক্ষ্ণ শূলও খান্ খান্ হয়ে পড়ে গেল।

একটুখানি ম্লান হেসে বললেন, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে প'ড়ে ফেলেছিলুম সদু, আমাকে মাপ কর।

এই প্রথম তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন।

বললুম, মিথ্যে কথা। তা হ'লে আমার চিঠি আমাকে দিতে। কেন এ খবর লুকিয়েচ, তাও জানি।

তিনি বললেন, শুধু দুঃখ পেতে বই ত নয়। তাই ভেবেছিলুম, কিছু দিন পরে তোমাকে জানাব।

বললুম, কেমন করে তুমি হাত গোণো, সে আমার জানতে বাকি নেই! তুমিই কি বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছ? স্পাই! ইংরেজ-মহিলারা এমন স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখে না, তা জান?

ওরে হতভাগী! বল, বল, যা মুখে আসে ব'লে নে। শাস্তি তোর গেছে কোথায়, সবই যে তোলা রইল!

স্বামী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না। এখন ভাবি, এত ক্ষমা কর্‌তেও মানুষে পারে!

কিন্তু আমার ভেতরে যত গ্লানি, যত অপমান এতদিন ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছিল, একবার মুক্তি পেয়ে তারা কোন মতেই আর ফির্‌তে চাইল না।

একটু থেমে আবার বললুম, আমি হেঁসেলে ঢুকতে—

তিনি একটুখানি যেন চমকে উঠে মাঝখানেই বলে উঠলেন, উঃ, তাই বটে! তাই আমার খাবার ব্যবস্থাটা আবার—

বললুম, সে নালিশ আমার নয়। বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছি বলেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে আমাকে তিল তিল করে মারবে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতেই দেব না, তা নিশ্চয় জেনো। আমার মামার বাড়ীতে এখনো ত রান্নাঘরটা বাকি আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাব। কাল আমি যাচ্ছি।

স্বামী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বল্‌লেন, যাওয়াই উচিত বটে। কিন্তু তোমার গয়নাগুলো রেখে যেয়ো।

শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম। এত হীন, এত ছোট স্বামীর স্ত্রী আমি। পোড়া মুখে হঠাৎ হাসি এল। বল্‌লুম, সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত বেশ, আমি রেখেই যাব।

প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাঁর মুখখানি যেন শাদা হয়ে গেল। বল্‌লেন, না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার টাকার বড় অনটন, তাই বাঁধা দেব।

কিন্তু এম্‌নি পোড়াকপালী আমি যে, ও-মুখ দেখেও কথাটা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লুম না। বল্‌লুম বাঁধা দাও, বেচে ফ্যাল, যা ইচ্ছে কর, তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই। ব'লে, তখুনি বাক্স খুলে আমার সমস্ত গয়না বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। যে দুগাছি বালা মা দিয়েছিলেন, সেই দুটি ছাড়া গা থেকে পর্য্যন্ত গয়না খুলে ফেলে দিলুম। তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, বেনারসী কাপড় জামা প্রভৃতি যা কিছু এঁরা দিয়েছিলেন, সমস্ত বার ক'রে টান্ মেরে ফেলে দিলুম।

স্বামী পাথরের মত স্থির নির্ব্বাক হ'য়ে ব'সে রইলেন। আমার ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা এমনি বিষিয়ে উঠ্‌ল যে, এক ঘরের মধ্যে থাকাও অসহ্য হ'য়ে পড়্‌ল। বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দায় একেবারে আঁচল পেতে শুয়ে পড়লুম। মনে হ'ল, দোরের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে গেল।

কান্নায় বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল, তবু প্রাণপণে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মান বাঁচালুম।

কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনে, উঠে দেখি, ভোর হয় হয়। ঘরে গিয়ে দেখি, বিছানা খালি, দু-একখানি ছাড়া প্রায় সমস্ত গয়নাই নিয়ে তিনি কখন বেরিয়ে গেছেন।

সারাদিন তিনি বাড়ি এলেন না। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নাই।

তন্দ্রার মধ্যেও বোধ করি সজাগ ছিলুম। রাত্রি দুটোর পর বাগানের দিকেই সেই জানালাটার গায়ে খট্ খট্ শব্দ শুনেই বুঝলুম, এ নরেন। কেমন করে যেন আমি নিশ্চয় জানতুম, আজ রাত্রে সে আসবে। স্বামী ঘরে নেই, এ খবর মুক্ত দেবেই এবং এ সুযোগ সে কিছুতে ছাড়্‌বে না। কোথাও কাছা-কাছি সে যে আছেই, এ যেন আমি ভারী অমঙ্গলের মত অনুভব কর্‌তুম। নরেন এত নিঃসংশয় ছিল যে সে অনায়াসে বল্‌লে, দেরি ক'র না, যেমন আছ বেরিয়ে এস, মুক্ত খিড়কি খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বাগান পার হ'য়ে রাস্তা দিয়ে অনেকখানি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বস্‌লুম। মা বসুমতি! গাড়ীশুদ্ধ হতভাগীকে সেদিন গ্রাস কর্‌লে না কেন?

কলকাতায় বৌবাজারের একটা ছোট্ট বাসায় গিয়ে যখন উঠলুম, তখন বেলা সাড়ে আটটা। আমাকে পৌঁছে দিয়েই নরেন তার নিজের বাসায় কিছুক্ষণের জন্য চ'লে গেল। দাসী উপরের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছিল, টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আশ্চর্য্য যে, যে কথা কখনও ভাবিনি, সমস্ত ভাবনা ছেয়ে সেই কথাই আমার মনে পড়্‌তে লাগল। আমি ন'বছর বয়সে একবার জলে ডুবে যাই, অনেক যত্ন-চেষ্টার পরে জ্ঞান হ'লে মায়ের হাত ধ'রে ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি! মা শিয়রে ব'সে এক হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, এক হাতে পাখার বাতাস করেছিলেন—মায়ের মুখ, আর তাঁর সেই পাখা নিয়ে হাত নাড়াটা ছাড়া সংসারে আর যেন আমার কিছু রইল না।

দাসী এসে বল্‌লে, বৌমা, কলের জল চ'লে যাবে, উঠে চান ক'রে নাও।

স্নান ক'রে এলুম, উড়ে-বামুন ভাত দিয়ে গেল। মনে হয় কিছু খেয়েও ছিলুম, কিন্তু উঠ্‌তে না উঠ্‌তে সমস্ত বমি হয়ে গেল। তার পর হাত-মুখ ধুয়ে নির্জ্জীবের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌বামাত্রই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম

স্বপ্ন দেখলুম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করচি। তিনি তেমনি নীরবে ব'সে আছেন, আর আমি গায়ের গয়না খুলে তাঁর গায়ে ছুঁড়ে ফেল্‌চি; কিন্তু গয়নাগুলোও আর ফুরোয় না, আমার ছুঁড়ে ফেলাও থামে না। যত ফেলি ততই যেন কোথা থেকে গয়নায় সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে উঠে!

হঠাৎ হাতের ভারি অনন্তটা ছুঁড়ে ফেল্‌তেই সেটা সজোরে গিয়ে তাঁর কপালে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন, আর সেই কাটা কপাল থেকে রক্তের ধারা ফিন্‌কি দিয়ে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকতে লাগল।

এমন করে কতক্ষণ যে কেটেছিল, আর কতক্ষণ যে কাটতে পারত, বল্‌তে পারিনে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন চোখের জলে বালিস বিছানা ভিজে গেছে।

চোখ চেয়ে দেখি, তখন অনেক বেলা আছে, আর নরেন পাশে ব'সে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্চে।

সে বল্‌লে, স্বপন দেখছিলে? ইস্, এ হয়েচে কি! ব'লে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে।

স্বপন? এক মুহূর্ত্তে মনটা যেন স্বস্তিতে ভ'রে গেল।

চোখ রগড়ে উঠে ব'সে দেখ্‌লুম সুমুখেই মস্ত একটা কাগজে-মোড়া পার্শ্বেল।

ও কি?

তোমার জামা কাপড় সব কিনে আন্‌লুম।

তুমি কিন্‌তে গেলে কেন ?

নরেন একটু হেসে বল্‌লে, আমি ছাড়া আর কে কিন্‌বে ?

* * * *

এত কান্না আমি আর কখনও কাঁদিনি। নরেন বল্‌লে, আচ্ছা, পা ছেড়ে উঠে ব'স বোন্, আমি দিব্যি কর্‌ছি, আমরা এক মায়ের পেটের ভাই বোন। তোকে আমি যত ভালই বাসিনে কেন, তবু আমি আমার কাছ থেকে তোকে চিরকাল রক্ষে কর্‌ব।

চিরকাল ! না না, তাঁর পায়ের ওপর আমাকে তোমরা ফেলে দিয়ে চ'লে এস নরেনদাদা, আমার অদৃষ্টে যা হবার তা হোক্। কাল সমস্ত রাত্রি তাঁকে চোখে দেখিনি, আজ আবার সমস্ত রাত্রি দেখতে না পেলে যে আমি ম'রে যাব ভাই !

দাসী ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। নরেন উঠে গিয়ে একটা মোড়ার ওপর ব'সে বল্‌লে, মুকুর কাছে আমি সমস্ত শুনেচি ! কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাসতে, কোন দিন এক সঙ্গে ত—

তাড়াতাড়ি বললুম, তুমি আমার বড়ভাই, এ সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেস ক'র না।

নরেন অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বললে, আমি আজই তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আস্‌তে পারি, কিন্তু তিনি কি তোমাকে নেবেন ? তখন গ্রামের মধ্যে তোমার কি দুর্গতি হবে বল ত ? বুকের ভেতরটা কে যেন দুহাতে পাকিয়ে মুচড়ে দিলে। কিন্তু তখ্‌খুনি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বললুম, ঘরে নেবেন না সে জানি, কিন্তু তিনি যে আমাকে মাপ কর্‌বেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপমান হোক্ সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বলবার যো নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেচি ভাই ! আমাকে তুমি তাঁর পায়ের

তলায় রেখে এস নরেনদাদা, ভগবান্ তোমাকে রাজ্যেশ্বর করবেন, আমি কায়মনে বলচি।

মনে করেছিলুম, আর চোখের জল ফেলব না, কিন্তু কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারলুম না, আবার ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়তে লাগল। নরেন মিনিট-খানেক চুপ ক'রে থেকে বললে, সদু, তুমি কি সত্যিই ভগবান মান?

আজ চরম দুঃখে মুখ দিয়ে পরম সত্য বার হয়ে গেল; বললুম, মানি! তিনি আছেন বলেই ত এত ক'রেও ফিরে যেতে চাইচি। নইলে এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম নরেনদাদা, ফিরে যাবার কথা মুখে আনতুম না!

নরেন বললে, কিন্তু আমি ত মানিনে।

তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলুম, আমি বলচি, আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয় মানবে।

সে তখন বোঝা যাবে! বলে নরেন গম্ভীর মুখে ব'সে রইল। মনে মনে কি যেন ভাবচে বুঝতে পেরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। আমার এক মিনিট দেরি সইছিল না, বললুম, আমাকে কখন রেখে আসবে নরেনদাদা?

নরেন মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, সে কখখনো তোমাকে নেবে না।

সে চিন্তা কেন করচ ভাই? নিন্ না নিন্ সে তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন, এ কথা নিশ্চয় বলতে পারি।

ক্ষমা! না নিলে ক্ষমা করা, না করা দুই-ই সমান। তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কত বড় একটা বিশ্রী হৈ-চৈ গণ্ডগোল প'ড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি!

ভয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললুম, সে ভাবনা তুমি এতটুকু ক'র না নরেনদাদা। তখন তিনি আমার উপায় ক'রে দেবেন!

নরেন আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, আর তোমারই না হয় একটা উপায় করবেন, কিন্তু আমার ত করবেন না! তখন?

এ কথার কি যে জবাব দেব ভেবে পেলুম না। বললুম, তাতেই বা তোমার ভয় কি?

নরেন ম্লানমুখে জোর ক'রে একটু হেসে বললে, ভয়? এমন কিছু নয়, পাঁচ সাত বছরের জন্যে জেল খাটতে হবে। শেষকালে এমন ক'রে তুমি আমাকে ডোবাবে জানলে, আমি এতে হাতই দিতুম না। মনের এতটুকু স্থিরতা নেই; এ কি ছেলেখেলা?

আমি কেঁদে ফেলে বললুম, তবে আমার কি উপায় হবে ভাই? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না করে ত আমি কিছুতে বাঁচব না!

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, শুধু নিজের কথাই ভাবচ, আমার বিপদ ত ভাবচ না? এখন সব দিক না বুঝে আমি কোন কাজ করতে পারব না।

ও কি, বাসায় যাচ্চ না কি?

হুঁ।

রাগে, দুঃখে, হতাশ্বাসে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাথা কুটে কাঁদতে লাগলুম—তুমি সঙ্গে না যাও, এইখান থেকে আমার যাবার উপায় করে দাও, আমি একলা ফিরে যাব! ওগো, আমি তাঁর দিব্যি ক'রে বলচি আমি কারুর নাম করব না, কাউকে বিপদে জড়াব না, সমস্ত শাস্তি একা মাথা পেতে নেব। তোমার দুটি পায়ে পড়ি নরেনদা, আমাকে আটকে রেখে আমার আর সর্ব্বনাশ ক'র না!

মুখ তুলে দেখি, ঘরে সে নেই, পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে সদর-দরজায় দেখি, তালা বন্ধ। উড়ে-বামুন বললে, বাবু চাবি নিয়ে চলে গেছেন, কাল সকালে এসে খুলে দেবেন।

ঘরে ফিরে এসে আর একবার মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বললুম, ভগবান! কখনো তোমাকে ডাকিনি আজ ডাক্‌চি, তোমার একান্ত নিরুপায় মহাপাপিষ্ঠা সন্তানের গতি দাও।

আমার সে ডাক কত প্রচণ্ড, তার শক্তি যে কি দুর্নিবার, আজ সে শুধু আমিই জানি।

তবু সাত দিন কেটে গেল। কিন্তু কেমন ক'রে যে কাট্‌ল, সে ইতিহাস বলবার আমার সামর্থ্যও নেই ধৈর্য্যও নেই। সে যাক্‌।

বিকেল-বেলায় আমার ওপরের ঘরের জানালায় বসে নিচে গলির পানে তাকিয়ে ছিলুম। আফিসের ছুটি হয়ে গেছে, সারাদিনের খাটুনির পর বাবুরা বাড়ীমুখো হন্ হন্ ক'রে চ'লেছে। অধিকাংশই সামান্য গৃহস্থ। তাদের বাড়ীর ছবি আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে এখন সব চেয়ে কারা বেশি ব্যস্ত, জলখাবার সাজাতে, চা তৈরি কর্‌তে সব চেয়ে কারা বেশি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে, সেটা মনে হ'তেই বুকের ভেতরটা ধক্ ক'রে উঠ্‌ল। মনে পড়ল, তিনিও সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল। ডাকাডাকির পর কেউ হয়ত সাড়াও দিলে না। তার পরে, হয়ত মেজ্‌দেওরের খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটুখানি জলখাবারের যোগাড় মেজবৌ করে রেখেচে, না হয় ভুলেই গেছে! আমি ত আর নেই, ভুলতে ভয়ই বা কি! হয়ত বা শুধু এক গেলাস জল চেয়ে খেয়ে ময়লা বিছানাটা কোঁচা দিয়ে একটু ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়্‌বেন! তার পরে, রাত দুপুরে দুটো শুক্‌নো, ঝর্‌ঝরে ভাত, একটু ভাতে-পোড়া। ওবেলার একটুখানি ডাল হয়ত বা আছে, হয়ত বা গেছে। সকলের দিয়ে-থুয়ে দুধ একটু বাঁচে ত সে পরম ভাগ্য! নিরীহ ভাল মানুষ, কাউকে কড়া-কথা বল্‌তে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—

ওরে মহাপাতকি! এত বড় নি র মহাপাপ তোর চেয়ে বেশি সংসারে কেউ কি কোন দিন ক'রেছে? ইচ্ছে হ'ল এই লোহার গরাদেতে মাথাটা ছেঁচে ফেলে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার এইখানেই শেষ ক'রে দিই!

বোধ করি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দিকেই চোখ ছিল না, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দে চম্‌কে উঠে দেখি, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নরেন আর মুক্ত। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে নিজের বিছানায় উঠে এসে বসলুম; সেই দিন থেকে নরেন আর আসেনি। আমার সমস্ত মন যে কোথায় প'ড়ে আছে সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল, ব'লে ভয়ে এদিক মাড়াত না। তার নিজের ধারণা জন্মেছিল বিপদে পড়লে স্বামীর বিরুদ্ধে আমি তার উপকারেই লাগব না। তাই তার ভয়ও যেমন হয়েছিল, রাগও তেমনি হয়েছিল। ঘরে ঢুকে আমার দিকে চেয়েই দুজনে একসঙ্গে চম্‌কে উঠল, নরেন বললে, তোমার এত অসুখ করেছিল ত আমাকে খবর দাওনি কেন? তোমার বামুনটা ত আমার বাসা চেনে?

ঝি দালানে ঝাঁট দিচ্ছিল, সে খপ্‌ ক'রে ব'লে বসল, অসুখ করবে কেন? শুধু জল খেয়ে থাক্‌লে মানুষ রোগা হবে না বাবু? দুটি বেলা দেখছি ভাতের থালা যেমন বাড়া হয়, তেম্‌নি পড়ে থাকে। অর্দ্ধেক দিন ত হাতও দেন না। শুনে দুজনেই স্তব্ধ হয়ে আমার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার পর নরেন বাসায় চ'লে গেলে, মুক্তকে নিচে টেনে নিয়ে বললুম, কেমন আছেন তিনি?

মুক্ত কেঁদে ফেললে। বললে, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বৌমা, নইলে এমন সোয়ামীর ঘর করতে পেলে না?

তুই ত ঘর করতে দিলি না মুক্ত!

মুক্ত চোখ মুছে বললে, মনে হ'লে বুকের ভেতরটায় যে কি কর্‌তে থাকে, সে আর তোমাকে কি বলব? বাবু ছাড়া আজও সবাই জানে তুমি বাড়ী-পোড়ার খবর পেয়ে রাত্তিরেই রাগারাগি ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেছ। তোমার শাশুড়ী তাঁর হুকুম নেওয়া হয়নি ব'লে রাগ ক'রে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তাই বন্ধ করে দিয়েচে। মাগী কি বজ্জাত মা, কি বজ্জাত। যে কষ্টটা বাবুকে দিচ্চে, দেখলে পাষাণের দুঃখ হয়। সাধে কি আর তুমি ঝগড়া করতে বৌমা।

ঝগড়া করা আমার চিরকালের জন্যে ঘুচে গেল। বলতে গিয়ে সত্যি সত্যি যেন দম্ আটকে এল।

আজ মুক্তর কাছে শুন্‌তে পেলুম, আমাদের পোড়া-বাড়ী আবার মেরামত হচ্চে, তিনি টাকা দিয়েছেন। হয়ত সেই জন্যেই আমার গহনাগুলো হঠাৎ বাঁধা দেবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

বললুম, বল মুক্ত, সব বল। যত রকমের বুক-ফাটা খবর আছে সমস্ত আমাকে একটি একটি ক'রে শোনা, এতটুকু দয়া তোরা আমাকে করিস্‌নে।

মুক্ত বললে, এ বাড়ীর ঠিকানা তিনি জানেন।

শিউরে উঠে বললুম, কি ক'রে?

মাস-খানেক আগে যখন এ বাড়ী তোমার জন্যেই ভাড়া নেওয়া হয় তখন আমি জানতুম।

তার পর?

একদিন নদীর ধারে নরেনবাবুর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে কথা কইতে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন।

তার পর?

বামুনের পা ছুঁয়ে মিথ্যে বলতে পার্‌লুম না বৌমা—চলে আসবার দিন এ বাসার ঠিকানা বলে ফেললুম।

এলিয়ে মুক্তর কোলের ওপরেই চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে মুক্ত বললে, বৌমা।

কেন মুক্ত?

যদি তিনি নিজে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসে পড়েন?

প্রাণপণ বলে উঠে ব'সে মুক্তর মুখ চেপে ধরলুম—না মুক্ত, ও-কথা তোকে আমি বলতে দেব না। আমার দুঃখ আমাকে সজ্ঞানে বইতে দে, পাগল ক'রে দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ ক'রে দিস্‌নে?

মুক্ত জোর ক'রে তার মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আমাকেও ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৌমা? টাকার সঙ্গে ত ওকে ওজন ক'রে ঘরে তুলতে পারব না।

এ কথার আর জবাব দিলুম না, চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম। মনে মনে বললুম, ওরে মুক্ত, পৃথিবী এখনও পৃথিবী আছে। আকাশ-কুসুমের কথা কানেই শোনা যায়, তাকে ফুটতে কেউ আজও চোখে দেখেনি।

ঘণ্টা-খানেক পরে মুক্ত নিচে থেকে ভাত খেয়ে ফিরে এল, তখন রাত্রি দশটা। ঘরে ঢুকেই বললে, মাথার আঁচলটা তুলে দাও বৌমা, বাব আসছেন, বলেই বেরিয়ে গেল।

আবার এত রাত্রে? তাড়াতাড়ি কাপড় সেরে উঠে বসতেই দেখলুম, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন নয়, আমার স্বামী।

বললেন, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি জানি, তুমি আমারই আছ। বাড়ী চল।

মনে মনে বললুম, ভগবান! এত যদি দিলে, তবে আরও একটু দাও, ওই দুটি পায়ে মাথা রাখবার সময়টুকু পর্য্যন্ত আমাকে সচেতন রাখ।

১

একাদশী বৈরাগী

কালীদহ গ্রামটা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ইহার গোপাল মুখুয্যের ছেলে অপূর্ব্ব ছেলে-বেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল। এবার সে যখন বছর পাঁচ-ছয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া অনার-সমেত বি-এ পাশ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের মধ্যে তাহার প্রসার-প্রতিপত্তির আর অবধি রহিল না। গ্রামের মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ একটা হাইস্কুল ছিল—তাহার সমবয়সীরা ইতিমধ্যে ইহাতেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া, সন্ধ্যাহ্নিক ছাড়িয়া দিয়া দশ আনা ছ'আনা চুল ছাঁটিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতা-প্রত্যাগত এই গ্রাজুয়েট ছোক্‌রার মাথার চুল সমান করিয়া তাহারই মাঝখানে একখণ্ড নধর টিকির সংস্থান দেখিয়া শুধু ছোকরা কেন, তাহাদের বাবাদের পর্য্যন্ত বিস্ময়ে তাক লাগিয়া গেল। সহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব্ব সনাতন হিন্দুদের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল। এখন সঙ্গীদের মধ্যে ইহাই মুক্ত-কণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল যে, এই হিন্দুধর্ম্মের মত এমন সনাতন ধর্ম্ম আর নাই; কারণ ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই বিজ্ঞান-সম্মত। টিকির বৈদ্যুতিক উপযোগিতা, দেহরক্ষা-ব্যাপারে সন্ধ্যাহ্নিকের পরম উপকারিতা, কাঁচকলা ভক্ষণের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি বহুবিধ অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রামের ছেলে বুড়ো নির্ব্বিশেষে অভিভূত হইয়া গেল এবং তাহার ফল হইল এই যে, অনতিকাল মধ্যেই ছেলেদের টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, একাদশী, পূর্ণিমা ও গঙ্গাস্নানের

ঘটায় বাড়ীর মেয়েরাও হার মানিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার, দেশোদ্ধার ইত্যাদির জল্পনায় কল্পনায় যুবকমহলে একেবারে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। বুড়ারা বলিতে লাগিল, হাঁ, গোপাল মুখুয্যের বরাত বটে! মা কমলারও যেমন সুদৃষ্টি, সন্তান জন্মিয়াছেও তেম্নি। না হইলে আজকালকার কালে এতগুলো ইংরাজী পাশ করিয়াও এই বয়সে এমনি ধর্ম্মে মতিগতি কয়টা দেখা যায়। সুতরাং দেশের মধ্যে অপূর্ব্ব একটা অপূর্ব্ব বস্তু হইয়া উঠিল। তাহার হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী, ধূমপান-নিবারণী ও দুর্নীতি দলনী—এই তিন তিনটা সভার আস্ফালনে গ্রামে চাষাভূষার দল পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাঁচকড়ি তেওর তাড়ি খাইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল শুনিতে পাইয়া অপূর্ব্ব সদলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এম্নি শাসিত করিয়া দিল যে, পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ী পলাইয়া গেল। ভগা কাওরা অনেক রাত্রে বিল হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে গাঁজার ঝোঁকে নাকি বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর গান গাহিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণপাড়ার অবিনাশের কানে যাওয়ায়, সে তার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া তবে ছাড়িয়া দিল। দুর্গা ডোমের চৌদ্দ-পনর বছরের ছেলে বিড়ি খাইয়া মাঠে যাইতেছিল, অপূর্ব্বর দলের ছোকরার চোখে পড়ায়, সে তাহার পিঠের উপর সেই জ্বলন্ত বিড়ি চাপিয়া ধরিয়া ফোস্কা তুলিয়া দিল। এম্নি করিয়া অপূর্ব্বর হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী ও দুর্নীতি-দলনী সভা ভানুমতীর আমগাছের মত সদ্য সদ্যই ফুলেফলে কালীদহ গ্রামটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এইবার গ্রামের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়া অপূর্ব্বর চোখে পড়িল যে স্কুলের লাইব্রেরীতে শশীভূষণের দেড়খানা মানচিত্র ও বঙ্কিমের আড়াইখানা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই দীনতার জন্য সে হেডমাষ্টারকে অশেষ রূপে লাঞ্ছিত করিয়া অবশেষে নিজেই লাইব্রেরী গঠন করিতে কোমর

বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। তাহার সভাপতিত্বে চাঁদার খাতা, আইন-কানুনের তালিকা এবং পুস্তকের লিষ্ট তৈরী হইতে বিলম্ব হইল না। এতদিন ছেলেদের ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সহিয়াছিল, কিন্তু দুই-একদিনের মধ্যেই তাহাদের চাঁদা আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র গৃহস্থের কাছে এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্ম্ম-প্রচার দুর্নীতি-দলনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল, লাইব্রেরীর জন্য অর্থ সংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব্ব কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ভারি সুরাহা চোখে পড়িল। স্কুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত, পোড়ো ভিটার প্রতি একদিন অপূর্ব্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শোনা গেল, ইহা একাদশী বৈরাগীর। অনুসন্ধান করিতে জানা গেল, লোকটা কি একটা গর্হিত সামাজিক অপরাধ করায় গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাহার ধোপা, নাপিত, মুদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বছর-দশেক পূর্ব্বে উদ্বাস্তু করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুর গ্রামে বাস করিতেছে। লোকটা নাকি টাকার কুমীর, কিন্তু তাহার সাবেক নাম যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না—হাঁড়ি ফাটার ভয়ে বহুদিনের অব্যবহারে মানুষের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে। তদবধি এই একাদশী নামেই বৈরাগী মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ। অপূর্ব্ব তাল ঠুকিয়া কহিল, টাকার কুমীর! সামাজিক কদাচার! তবে ত এই ব্যাটাই লাইব্রেরীর অর্দ্ধেক ভার বহন করিতে বাধ্য। না হইলে সেখানের ধোপা, নাপিত, মুদীও বন্ধ! বারুইপুরের জমীদার ত দিদির মামাশ্বশুর।

ছেলেরা মাতিয়া উঠিল এবং অবিলম্বে ডোনেশনের খাতায় বৈরাগীর নামের পিছনে একটা মস্ত অঙ্কপাত হইয়া গেল। একাদশীর কাছে

টাকা আদায় করা হইবে, না হইলে অপূর্ব্ব তাহার দিদির মামাশ্বশুরকে বলিয়া বারুইপুরেও ধোপা, নাপিত বন্ধ করিবে, সংবাদ পাইয়া রসিক স্মৃতিরত্ন লাইব্রেরীর মঙ্গলার্থ উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিয়া গেলেন যে, বেশ একটু মোটা টাকা না দিলে মহাপাপী ব্যাটা কালীদহে বাস্তু কি করিয়া রক্ষা করে, দেখিতে হইবে। কারণ বাস না করিলেও এই বাস্তুভিটার উপর একাদশীর যে অত্যন্ত মমতা, স্মৃতিরত্নের তাহা অগোচর ছিল না। যে হেতু বছর-দুই পূর্ব্বে এই জমিটুকু খরিদ করিয়া নিজের বাগানের অঙ্গীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবে তখন একাদশী অত্যন্ত সাধু ব্যক্তির ন্যায় কানে আঙ্গুল দিয়া বলিয়াছিল, এমন অনুমতি করবেন না ঠাকুরমশাই, ঐ এক ফোঁটা জমির বদলে ব্রাহ্মণের কাছে দাম নিতে আমি কিছুতেই পারব না। ব্রাহ্মণের সেবায় লাগ্‌বে, এ ত আমার সাত-পুরুষের ভাগ্য। স্মৃতিরত্ন নিরতিশয় পুলকিত চিত্তে তাহার দেব-দ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধার লক্ষকোটি সুখ্যাতি করিয়া অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করার পরে, একাদশী করযোড়ে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল, কিন্তু এমনি পোড়া অদৃষ্ট ঠাকুরমশাই, যে সাত-পুরুষের ভিটে আমার কিছুতেই হাতছাড়া করবার জো নাই। বাবা মরণকালে মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লে গিয়েছিলেন, খেতেও যদি না পাস্‌ বাবা, বাস্তুভিটে কখনো ছাড়িস্‌নে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আক্রোশ স্মৃতিরত্ন বিস্মৃত হন নাই!

দিন-পাঁচেক পরে, একদিন সকাল-বেলা এই ছেলের দলটি দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একাদশীর সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়িটি মাটির, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মীশ্রী আছে। অপূর্ব্ব কিংবা তাহার দলের আর কেহ একাদশীকে পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই;

সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়াই তাহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এ লোক টাকার কুমীর হোক, হাঙ্গরই হোক, লাইব্রেরীর সম্বন্ধে যে পুঁটী মাছটির উপকারে আসিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ! একাদশীর পেশা তেজারতি। বয়স ষাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ, তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠভরা তুলসীর মালা। দাড়ী-গোঁফ কামান, মুখখানার প্রতি চাহিলে মনে হয় না যে কোথাও ইহার লেশমাত্র রসকস আছে। ইক্ষু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক করে, এ ব্যক্তি যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া শুষ্ক করিবার জন্যই নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিঙ্‌ড়াইয়া বিসর্জ্জন দিয়া মহাজন হইয়া বসিয়া আছে। তাহার শুধু চেহারা দেখিয়াই অপূর্ব্ব মনে মনে দমিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপের উপর ঢালা বিছানা। মাঝখানে একাদশী বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে একটা কাঠের হাত-বাক্স এবং একপাশে থাক-দেওয়া হিসেবের খাতাপত্র। একজন বৃদ্ধ-গোছের গোমস্তা খালি-গায়ে পৈতার গোছা গলায় ঝুলাইয়া শ্লেটের উপর সুদের হিসাব করিতেছে। এবং সম্মুখে, পার্শ্বে, বারান্দায় খুঁটির আড়ালে নানা বয়সের নানা অবস্থার স্ত্রী-পুরুষ, ম্লান মুখে বসিয়া আছে। কেহ ঋণ গ্রহণ করিতে, কেহ সুদ দিতে, কেহ বা শুধু সময় ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছে, কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্য কেহ যে বসিয়াছিল, তাহা কাহারও মুখ দেখিয়া মনে হইল না।

অকস্মাৎ কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রসন্তান দেখিয়া একাদশী বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিল। গোমস্তা শ্লেটখানা রাখিয়া দিয়া কহিল, কোত্থেকে আসছেন?

অপূর্ব্ব কহিল, কালীদহ থেকে।

মশায় আপনারা?

আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া একাদশী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ঝুঁকাইয়া প্রণাম করিল; কহিল, বসতে আজ্ঞা হোক্!

সকলে উপবেশন করিলে একাদশী নিজেও বসিল। গোমস্তা প্রশ্ন করিল, আপনাদের কি প্রয়োজন?

অপূর্ব্ব লাইব্রেরীর উপকারিতা-সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া চাঁদার কথা পাড়িতে গিয়া দেখিল, একাদশীর ঘাড় আর একদিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুঁটির আড়ালের স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর মা? সুদ ত হয়েছে কুল্‌লে সাত টাকা দুআনা; তার দু আনাই যদি ছাড়্‌ করে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের ক'রে ফেল না কেন?

তাহার পরে উভয়ে এম্‌নি ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করিয়া দিল, যেন এই দুআনা পয়সার উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু হারুর মাও যেমন স্থিরসঙ্কল্প, একাদশীও তেমনি অটল। দেরী হইতেছে দেখিয়া অপূর্ব্ব উভয়ের বাগ্‌বিতণ্ডার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, আমাদের লাইব্রেরীর কথাটা—

একাদশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, আজ্ঞে, এই যে শুনি;—হাঁ রে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবুতে চাস রে! সে দুটাকা এখনো শোধ দিলিনে, আবার একটাকা চাইতে এসেছিস্ কোন্ লজ্জায় শুনি? বলি সুদ-টুদ কিছু এনেছিস্?

নফর ট্যাঁক খুলিয়া এক আনা পয়সা বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙাইয়া কহিল, তিন মাস হয়ে গেল না রে? আর দুটো পয়সা কই?

নফর হাত-যোড় করিয়া বলিল, আর নেই কর্ত্তা; ধাড়াবপোর কত

হাতে-পায়ে প'ড়ে পয়সা চারটী ধার ক'রে আন্‌চি, বাকি দুটো পয়সা আসচে হাট-বারেই দিয়ে যাব।

একাদশী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, দেখি তোর ওদিকের ট্যাঁকটা?

নফর বাঁ-দিকের ট্যাঁকটা দেখাইয়া অভিমানভরে কহিল, দুটো পয়সার জন্য মিছে কথা কইচি কর্ত্তা? যে শালা পয়সা এনেও তোমাদের ঠকায়, তার মুখে পোকা পড়ুক, এই বলে দিলুম।

একাদশী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তুই চারটে পয়সা ধার ক'রে আনতে পারলি, আর দুটো এম্‌নি ধার কর্‌তে পার্‌লিনে?

নফর রাগিয়া কহিল, মাইরি দিলাসা কর্‌লুম না কর্ত্তা। মুখে পোকা পড়ুক—

অপূর্ব্বর গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা লোক তুমি মশায়!

একাদশী একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, কোন কথা কহিল না। পরাণ বাগ্‌দী সম্মুখের উঠান দিয়া যাইতেছিল; একাদশী হাত নাড়িয়া ডাকিয়া কহিল, পরাণ, নফ্‌রার কাছাটা একবার খুলে দেখ্‌ত রে, পয়সা দুটো বাঁধা আছে না কি?

পরাণ উঠিয়া আসিতেই নফর রাগ করিয়া তাহার কাছার খুঁটে বাঁধা পয়সা দুটো খুলিয়া একাদশীর সুমুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। একাদশী এই বেয়াদপিতে কিছুমাত্র রাগ করিল না। গম্ভীর-মুখে পয়সা ছয়টা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া গোমস্তাকে কহিল, ঘোষালমশাই, নফরার নামে সুদ আদায় জমা ক'রে নেন। হাঁ রে, একটা টাকা কি আবার কর্‌বি রে?

নফর কহিল, আবশ্যক না হ'লেই কি এসেচি মশাই?

একাদশী কহিল, আট আনা নিয়ে যা না! গোটা টাকা নিয়ে গেলেই ত নয়-ছয় করে ফেল্‌বি রে।

তার পর অনেক কষা-মাজা করিয়া নফর মোড়ল বারো আনা পয়সা কর্জ্জ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অপূর্ব্বর সঙ্গী অনাথ চাঁদার খাতাটা একাদশীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, যা দেবেন দিয়ে দিন মশাই, আমরা আর দেরী কর্‌তে পারিনে।

একাদশী খাতাটা তুলিয়া লইয়া প্রায় পোনর মিনিট ধরিয়া আগাগোড়া তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খাতাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, আমি বুড়োমানুষ, আমার কাছে আবার চাঁদা কেন?

অপূর্ব্ব কোনমতে রাগ সামলাইয়া কহিল, বুড়োমানুষ টাকা দেবে না ত কি ছোটছেলেতে টাকা দেবে? তারা পাবে কোথায় শুনি?

বুড়ো সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, ইস্কুল ত হয়েছে কুড়ি-পঁচিশ বছর; কৈ, এতদিন ত কেউ লাইব্রেরীর কথা তোলেনি বাপু? তা যাক, এ ত আর মন্দ কাজ নয়, আমাদের ছেলেপুলে বই পড়ুক আর না পড়ুক, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই পড়্‌বে ত! কি বল ঘোষালমশাই? ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া কি যে বলিল, বোঝা গেল না। একাদশী কহিল, তা বেশ, চাঁদা দেব আমি, একদিন এসে নিয়ে যাবেন চার আনা পয়সা। কি বল, ঘোষাল, এর কমে আর ভাল দেখায় না! অতদূর থেকে ছেলেরা এসে ধরেছে, যা হোক একটু নাম-ডাক আছে বলেই ত? আরও ত লোক আছে, তাদের কাছে ত চাইতে যায় না, কি বল হে?

ক্রোধে অপূর্ব্বর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অনাথ কহিল, এই চার আনার জন্যে আমরা এতদূরে এসেচি? তাও আবার আর একদিন

এসে নিয়ে যেতে হবে? একাদশী মুখে একটা শব্দ করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, দেখ্‌লেন ত অবস্থা, ছটা পয়সা হক্কের সুদ আদায় করতে ব্যাটাদের কাছে কি ছ্যাঁচ্‌ড়াপনাই না কর্‌তে হয়? তা এ পাট-টা বিক্রী না হয়ে গেলে আর চাঁদা দেবার সুবিধে—

অপূর্ব্বর রাগে ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল; বলিল, সুবিধে হবে এখানেও ধোপা-নাপিত বন্ধ হ'লে। ব্যাটা পিশাচ সর্ব্বাঙ্গে ছিটে-ফোঁটা কেটে জাত হারিয়ে বোষ্টম হয়েছেন, আচ্ছা!

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা আঙুল তুলিয়া শাসাইয়া কহিল, বারুইপুরের রাখালদাসবাবু আমাদের কুটুম্ব, মনে থাকে যেন বৈরাগী!

বুড়া বৈরাগী এই অভাবনীয় কাণ্ডে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। বিদেশী ছেলেদের অকস্মাৎ এত ক্রোধের হেতু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব্ব বলিল, গরীবের রক্ত শুষে সুদ খাওয়া তোমার বার কর্‌ব তবে ছাড়্‌ব।

নফর তখনও বসিয়াছিল; তাহার কাছায় বাঁধা পয়সা দুটো আদায় করার রাগে মনে মনে ফুলিতেছিল; সে কহিল, যা কইলেন কর্ত্তা, তা ঠিক। বৈরাগী ত নয় পিচেশ! চোখে দেখলেন ত কি ক'রে মোর পয়সা দুটো আদায় নিলে!

বুড়ার লাঞ্ছনায়, উপস্থিত সকলেই মনে মনে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিপিন উৎসাহিত হইয়া চোখ টিপিয়া বলিয়া উঠিল, তোমরা ত ভেতরের কথা জান না, কিন্তু আমাদের গাঁয়ের লোক, আমরা সব জানি। কি গো বুড়ো, আমাদের গাঁয়ে কেন তোমার ধোপা-নাপ্‌তে বন্ধ হ'য়েছিল বল্‌ব?

খবরটা পুরাতন। সবাই জানিত। একাদশী সদ্‌গোপের ছেলে, জাত-বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্রেয়-ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া

কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ-মরা এই বৈমাত্র ছোটবোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল; তাহার ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিল; আবার অল্প বয়সে বিধবা হইয়া গেলে, দাদার ঘরেই সে আদর যত্নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে এই ভগিনীর এত বড় পদস্খলনে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল; আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, তখন গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিতা, একান্ত অনুতপ্তা, দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে একাদশী কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল। কথাটা সবাই জানিত; তথাপি আর একজনের মুখ হইতে আর একজনের কলঙ্ক কাহিনীর মাধুর্য্যটা উপভোগ করিবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু একাদশী লজ্জায় ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। তাহার নিজের জন্য নয়, ছোট বোনটির জন্য। প্রথম যৌবনের অপরাধ গৌরীর বুকের মধ্যে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও যে তাহা তেমনি আছে, তিলার্দ্ধও শুষ্ক হয় নাই, বৃদ্ধ তাহা ভালরূপেই জানিত। পাছে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও তাহার কানে গিয়া সেই ব্যথা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় একাদশী বিবর্ণ-মুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার এই

সকরুণ দৃষ্টির নিরব মিনতি আর কাহারও চক্ষে পড়িল না, কিন্তু অপূর্ব্ব হঠাৎ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।

বিপিন বলিতে লাগিল, আমরা কি ভিখারী যে দুকোশ পথ হেঁটে এই রৌদ্রে চারগণ্ডা পয়সা ভিক্ষে চাইতে এসেচি। তাও আবার আজ নয়, কবে ওঁর কোন্ খাতকের পাট বিক্রী হবে, সেই খবর নিয়ে আমাদের আর একদিন হাঁটতে হবে—তবে যদি বাবুর দয়া হয়! কিন্তু লোকের রক্ত শুষে সুদ খাও বুড়ো, মনে করেচ জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না? আমি এখানেও না তোমার হাড়ির হাল করি ত আমার নাম বিপিন ভট্টচার্য্যিই নয়! ছোট জাতের পয়সা হ'য়েচে ব'লে চোখে কানে আর দেখতে পাও না? চল হে অপূর্ব্ব, আমরা যাই, তার পরে যা জানি করা যাবে। বলিয়া সে অপূর্ব্বর হাত ধরিয়া টান দিল।

বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া অপূর্ব্বর অত্যন্ত পিপাসা বোধ হওয়ায় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে চাকরটাকে সে জল আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কলহ বিবাদে সে কথা মনে ছিল না। কিন্তু তাহার তৃষ্ণার জল এক হাতে এবং অন্য হাতে রেকাবীতে গুটি-কয়েক বাতাসা লইয়া একটি সাতাশ-আটাশ বছরের বিধবা মেয়ে পাশের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার জল চাওয়ার কথা স্মরণ হইল। গৌরীকে ছোটজাতের মেয়ে বলিয়া কিছুতে মনে হয় না। পরণে গরদের কাপড়; স্নানের পর বোধ করি এইমাত্র আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল, ব্রাহ্মণ জল চাহিয়াছে, চাকরের কাছে শুনিয়া সে আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কহিল, আপনাদের কে জল চেয়েছিলেন যে।

বিপিন কহিল, পাটের শাড়ী পরে এলেই বুঝি তোমার হাতে জল খাব আমরা? অপূর্ব্ব, ইনিই সে বিশ্বেশ্বরী হে!

চক্ষের নিমিষে মেয়েটির হাত হইতে বাতাসার রেকাবটা ঝনাৎ করিয়া নিচে পড়িয়া গেল এবং সেই অসীম লজ্জা চোখে দেখিয়া অপূর্ব্ব নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সক্রোধে বিপিনকে একটা কনুয়ের গুঁতো মারিয়া কহিল, এসব কি বাঁদরামি হচ্ছে? কাণ্ডজ্ঞান নেই?

বিপিন পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলহের মুখে অপমান করিতে নর-নারী ভেদাভেদ-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত নিরপেক্ষ বীরপুরুষ। সে অপূর্ব্বর খোঁচা খাইয়া আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া হাঁকিয়া কহিল, কেন, মিছে কথা বল্‌চি নাকি? ওর এত বড় সাহস যে, বামুনের ছেলের জন্যে জল আনে? আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি জান?

অপূর্ব্ব বুঝিল আর তর্ক নয়। অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। কহিল, আমি আন্‌তে বলেছিলুম বিপিন, তুমি না জেনে অনর্থক ঝগড়া ক'র না, চল, আমরা এখন যাই!

গৌরী রেকাবীটি কুড়াইয়া লইয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিঃশব্দে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তথা হইতে কহিল, দাদা, এঁরা যে কিসের চাঁদা নিতে এসেছিলেন, তুমি দিয়েচ?

একাদশী এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলের ন্যায় বসিয়াছিল, ভগিনীর আহ্বানে চকিত হইয়া বলিল, না, এই যে দিই দিদি।

অপূর্ব্বর প্রতি চাহিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, বাবুমশাই, আমি গরীব মানুষ! চার আনাই আমার পক্ষে ঢের, দয়া ক'রে নিন।

বিপিন পুনরায় কি একটা কড়া জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিল, অপূর্ব্ব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল; কিন্তু এত কাণ্ডের পর সেই চার আনার প্রস্তাবে তাহার নিজেরও অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, থাক্ বৈরাগী, তোমায় কিছু দিতে হবে না।

একাদশী বুঝিল, ইহা রাগের কথা; একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,

কলি কাল! বাগে পেলে কেউ কি কারও ঘাড় ভাঙতে ছাড়ে! দাও ঘোষালমশাই, পাঁচগণ্ডা পয়সাই খাতায় খরচ লেখ। কি আর করব বল। বলিয়া বৈরাগী পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া অপূর্ব্বর এবার হাসি পাইল। এই কুসীদজীবী বৃদ্ধের পক্ষে চার আনার এবং পাঁচ আনার মধ্যে কতবড় যে প্রকাণ্ড প্রভেদ, তাহা সে মনে মনে বুঝিল, মৃদু হাসিয়া কহিল, থাক্ বৈরাগী, তোমায় দিতে হবে না! আমরা চার-পাঁচ আনা পয়সা চাঁদা নিইনে! আমরা চললুম।

কি জানি কেন, অপূর্ব্ব একান্ত আশা করিয়াছিল, এই পাঁচ আনার বিরুদ্ধে দ্বারের অন্তরাল হইতে অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ আসিবে। তাহার অঞ্চলের প্রান্তটুকু তখনও দেখা যাইতেছিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। যাইবার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব যথার্থ-ই ক্ষোভের সহিত মনে মনে কহিল, ইহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দান করা সম্বন্ধে পাঁচ আনা পয়সার অধিক ইহাদের ধারণা নাই। পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস, পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না, এমন কাজ সংসারে নাই।

অপূর্ব্ব সদলবলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, একটি বছর-দশেকের ছেলের প্রতি অনাথের দৃষ্টি পড়িল। ছেলেটির গলায় উত্তরীয়, বোধ করি পিতৃ-বিয়োগ কিংবা এম্‌নি কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার বিধবা জননী বারান্দায় খুঁটির আড়ালে বসিয়া ছিল। অনাথ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটে, তুই যে এখানে?

পুঁটে আঙুল দেখাইয়া কহিল, আমার মা বসে আছেন। মা বললেন, আমাদের অনেক টাকা ওঁর কাছে জমা আছে। বলিয়া সে একাদশীকে দেখাইয়া দিল। কথাটা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া

উঠিল। ইহার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়, দেখিবার জন্ম অপূর্ব্ব নিজের আকণ্ঠ পিপাসা সত্ত্বেও বিপিনের হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

একাদশী প্রশ্ন করিল, তোমার নামটি কি বাবা? বাড়ি কোথায়?

ছেলেটি কহিল, আমার নাম শশধর; বাড়ি ওঁদের গাঁয়ে—কালীদহে।

তোমার বাবার নামটি কি?

ছেলেটির হইয়া এবার অনাথ জবাব দিল; কহিল, এর বাপ অনেক দিন মারা গেছে। পিতামহ রামলোচন চাটুয্যে ছেলের মৃত্যুর পর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন; সাত বৎসর পরে মাস-খানেক হ'ল ফিরে এসেছিলেন। পরশু এদের ঘরে আগুন লাগে, আগুন নিবোতে গিয়ে বৃদ্ধ মারা পড়েছেন। আর কেউ নেই, এই নাতিটিই শ্রাদ্ধাধিকারী।

কাহিনী শুনিয়া সকলে দুঃখ প্রকাশ করিল, শুধু একাদশী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরেই প্রশ্ন করিল, টাকার হাতচিঠা আছে? যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া কহিল, কাগজ-পত্র কিছু নেই, সব পুড়ে গেছে।

একাদশী প্রশ্ন করিল, কত টাকা?

এবার বিধবা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া জবাব দিল, ঠাকুর মরবার আগে ব'লে গেছেন, পাঁচ শ টাকা তিনি জমা রেখে তীর্থযাত্রা করেন। বাবা, আমরা বড় গরীব; সব টাকা না দাও, কিছু আমাদের ভিক্ষে দাও, বলিয়া বিধবা টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘোষালমশাই এতক্ষণ খাতা লেখা ছাড়িয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন, তিনিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বলি কেউ সাক্ষী-টাক্ষী আছে?

বিধবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। আমরাও জানতুম না। ঠাকুর গোপনে টাকা জমা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

ঘোষাল মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, শুধু কাঁদলেই ত হয় না বাপু। এসব মবলগ্ টাকাকড়ির কাণ্ড যে। সাক্ষী নেই, হাতচিঠা নেই, তা হ'লে কি রকম হবে বল দেখি?

বিধবা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কান্নার ফল যে কি হইবে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। একাদশী এবার কথা কহিল, ঘোষালের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমার মনে হচ্চে, যেন পাঁচ শ টাকা কে জমা রেখে আর নেয়নি। তুমি একবার পুরানো খাতাগুলো খুঁজে দেখ দিকি, কিছু লেখা-টেখা আছে না কি?

ঘোষাল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, কে এত বেলায় ভূতের ব্যাগার খাটতে যাবে বাপু? সাক্ষী নেই, রসিদ-পত্তর নেই—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারের অন্তরাল হইতে জবাব আসিল, রসিদ-পত্তর নেই ব'লে কি ব্রাহ্মণের টাকাটা ডুবে যাবে না কি? পুরানো খাতা দেখুন, আপনি না পারেন আমাকে দিন দেখে দিচ্চি।

সকলেই বিস্মিত হইয়া দ্বারের প্রতি চোখ তুলিল, কিন্তু যে হুকুম দিল, তাহাকে দেখা গেল না।

ঘোষাল নরম হইয়া কহিল, কত বছর হয়ে গেল মা। এতদিনের খাতা খুঁজে বার করা ত সোজা নয়। খাতা-পত্তরের আণ্ডিল। তা জমা থাকে, পাওয়া যাবে বৈ কি! বিধবাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তুমি বাছা কেঁদো না, হক্কের টাকা হয় ত পাবে বৈ কি। আচ্ছা, কাল একবার আমার বাড়ী যেয়ো; সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রে খাতা দেখে বার ক'রে দেব। আজ এত বেলায় ত আর হবে না।

বিধবা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, কাল সকালেই আপনার ওখানে যাব।

যেয়ো, বলিয়া ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া সম্মুখের খোলা খাতা সেদিনের মত বন্ধ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ছলে বিধবাকে বাড়িতে আহ্বান করার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্তরাল হইতে গৌরী কহিল, আট বছর আগের—তা হ'লে ১৩০১ সালের খাতাটা একবার খুলে দেখুন ত, টাকা জমা আছে কি না?

ঘোষাল কহিলেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের মা!

গৌরী কহিল, আমাকে দিন, আমি দেখে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের মেয়ে দুকোশ হেঁটে এসেছেন—দুকোশ এই রৌদ্রে হেঁটে যাবেন, আবার কাল আপনার কাছে আসবেন; এত হাঙ্গামায় কাজ কি ঘোষালকাকা?

একাদশী কহিল, সত্যিই ত ঘোষালমশাই, ব্রাহ্মণের মেয়েকে মিছামিছি হাঁটান কি ভাল? বাপ রে! দাও, দাও, চট্‌পট্ দেখে দাও।

ক্রুদ্ধ ঘোষাল কষ্টকষ্টে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে ১৩০১ সালের খাতা বাহির করিয়া আনিলেন। মিনিট-দশেক পাতা উল্টাইয়া হঠাৎ ভয়ানক খুসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, বাঃ! আমার গৌরীমায়ের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! ঠিক এক সালের খাতাতেই জমা পাওয়া গেল! এই যে রামলোচন চাটুয্যের জমা পাঁচ শ—

একাদশী কহিল, দাও, চটপট সুদটা ক'ষে দাও ঘোষালমশাই!

ঘোষাল বিস্মিত হইয়া কহিল, আবার সুদ?

একাদশী কহিল, বেশ, দিতে হবে না! টাকা এতদিন খেটেচে ত, ব'সে ত থাকেনি। আট বছরের সুদ, এই কমাস সুদ বাদ পড়বে।

তখন সুদে-আসলে প্রায় সাড়ে সাত শ টাকা হইল। একাদশী ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দিদি, টাকাটা তবে সিন্দুক থেকে বার ক'রে আন্। হাঁ বাছা, সব টাকাটাই এক সঙ্গে নিয়ে যাবে ত ?

বিধবার অন্তরের কথা অন্তর্যামী শুনিলেন। চোখ মুছিয়া প্রকাশ্যে কহিল, না বাবা, অত টাকার আমার কাজ নেই, আমাকে পঞ্চাশটি টাকা এখন শুধু দাও।

তাই নিয়ে যাও মা। ঘোষালমশাই, খাতাটা একবার দাও, সই ক'রে নিই ; আর বাকি টাকার তুমি একটা চিঠি ক'রে দাও।

ঘোষাল কহিল, আমি সই ক'রে নিচ্চি। তুমি আবার—

একাদশী কহিল, না না, আমাকেই দাও না ঠাকুর, নিজের চোখে দেখে দিই। বলিয়া খাতা লইয়া অর্দ্ধ মিনিট চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল, ঘোষালমশাই, এই যে একজোড়া আসল মুক্তা ব্রাহ্মণের নামে জমা রয়েছে। আমি জানি কি না, ঠাকুরমশাই আমাদের সব সময়ে চোখে দেখ্‌তে পায় না, বলিয়া একাদশী দরজার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। এতগুলি লোকের সুমুখে মনিবের সেই ব্যঙ্গোক্তিতে ঘোষালের মুখ কালি হইয়া গেল।

সেদিনের সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে, অপূর্ব্ব সঙ্গীদের লইয়া যখন উত্তপ্ত পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চলিতেছিল। ঘোষাল সঙ্গে ছিল, সে সবিনয়ে আহ্বান করিয়া কহিল, আসুন, গরীবের ঘরে অন্ততঃ একটু গুড় দিয়েও জল খেয়ে যেতে হবে।

অপূর্ব্ব কোন কথা না কহিয়া নিরবে অনুসরণ করিল। ঘোষালের গা জলিয়া যাইতেছিল, সে একাদশীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দেখলেন, ছোটলোক ব্যাটার আস্পর্দ্ধা! আপনাদের মত ব্রাহ্মণ-সন্তানের পায়ের ধুলো প'ড়েচে, হারামজাদার যোল-পুরুষের ভাগ্যি ; ব্যাটা শিখেচ কি না পাঁচ গণ্ডা পয়সা দিয়ে ভিখারী বিদেয় করতে চায়।

বিপিন কহিল, তুদিন সবুর করুন না; হারামজাদা মহাপাপীর ধোপা-নাপ্‌তে বন্ধ ক'রে পাঁচ গণ্ডা পয়সা দেওয়া বা'র ক'রে দিচ্চি। রাখালবাবু আমাদের কুটুম, সে মনে রাখবেন ঘোষালমশাই।

ঘোষাল কহিল, আমি ব্রাহ্মণ। তুবেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক না ক'রে জল-গ্রহণ করিনে, তুটো মুক্তোর জন্যে কি রকম অপমানটা তুপুর-বেলায় আমাকে করলে চোখে দেখলেন ত। ব্যাটার ভাল হ'বে? মনেও করবেন না। সে বেটী—যারে ছুঁলে নাইতে হয়, কিনা বামুনের ছেলের তেষ্টায় জল নিয়ে আসে, টাকার গুমরটা কি রকম হ'য়েচে, একবার ভেবে দেখুন দেখি।

অপূর্ব্ব এতক্ষণ একটা কথাতেও কথা যোগ করে নাই; সে হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, অনাথ, আমি ফিরে চল্‌লুম ভাই, আমার ভারি তেষ্টা পেয়েচে!

ঘোষাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ফিরে কোথায় যাবেন? ঐ ত আমার বাড়ি দেখা যাচ্চে।

অপূর্ব্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, আপনি এদের নিয়ে যান, আমি যাচ্চি ঐ একাদশীর বাড়িতেই জল খেতে!

একাদশীর বাড়িতে জল খেতে! সকলেই চোখ কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিপিন তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল, চল, চল—তুপুর রোদ্দুরে রাস্তার মাঝখানে আর ঢঙ্ করতে হবে না। তুমি সেই পাত্রই বটে! তুমি খাবে একাদশীর বোনের ছোঁয়া জল!

অপূর্ব্ব হাত টানিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, সত্যিই আমি তার দেওয়া সেই জলটুকু খাবার জন্য ফিরে যাচ্চি। তোমরা ঘোষালমশায়ের ওখান থেকে খেয়ে এস, ঐ গাছতলায় আমি অপেক্ষা ক'রে থাকব।

তাহার শান্ত স্থির কণ্ঠস্বরে হতবুদ্ধি হইয়া ঘোষাল কহিল, এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা জানেন ?

অনাথ কহিল, ক্ষেপে গেলে নাকি ?

অপূর্ব্ব কহিল, তা জানিনে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সে তখন ধীরে সুস্থে করা যাবে। কিন্তু এখন ত পারলাম না, বলিয়া সে এই খর-রৌদ্রের মধ্যে দ্রুতপদে একাদশীর বাড়ির উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬